শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দীপালী কার্য্যালয়

১২৩।১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা

১২৩।১ আপার সাকুলার বোড,

দীপালী প্রেস হইতে

শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

এ গ্রন্থের গল্পগুলি বহুদিন পূর্ব্বে **গল্পলহরী**, **ভারতবর্ষ** ও **সচিত্র শিশির** প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি—সন ১৩৪৩ সাল, ৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার—

১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী

নাট্যকার ও সুরসিক

অগ্রজকল্প ডাঃ শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ রায়ের

করকমলে—

শিক্ষয়িত্রী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বছর ত্রিশেকের যুবক হইলে কি হয়, ক্ষিতীশচন্দ্র হাকিম যেমন কড়া, লোকটিও ছিলেন তেমনি মিষ্ট। তাঁহার ন্যায়বিচারে, সবিনয় ব্যবহারে, সুমার্জ্জিত আলাপে সকলেই এমনি মুগ্ধ হইয়া গেল যে, তাঁহার ঝিনুকগাছি মহকুমায় বদলি হওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সমস্ত সাবডিভিশনে তাঁহার সুখ্যাতি রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভদ্রলোকেরা বলিল—লোকটি খাঁটি, ভদ্রলোক বটে। সাধারণে বলিল—গরীবের মা, বাপ। পরশ্রীকাতর নিন্দুকেরা বলিল—সবই বটে, তবে কিনা—ও-সব চাল।

ক্ষিতীশচন্দ্র আসিয়াই স্থানীয় লাইব্রেরিটির সংস্কার করাইলেন। নিজে নগদ এক শত টাকা দিয়া কিছু নূতন বই আনাইয়া দিলেন। হরি-সভা শৃগাল-সভায় পরিণত হইয়াছিল, নিজে তো চাঁদা দিলেনই, সাধারণের নিকট হইতেও কিছু তুলিয়া আবার সেটিকে খাড়া করিয়া তুলিলেন; অনেক লেখাপড়া করিয়া হাইস্কুলের জন্য সরকারী সাহায্যের মাত্রা

বাড়াইয়া দিয়া শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন; সহরের গলি গলি ঘুরিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অর্থে নর্দ্দমা ও জঙ্গল সাফ্ করাইয়া রাস্তার সংস্কার করাইয়া, সহরের শ্রী ফিরাইয়া দিলেন। লোকে ধন্য ধন্য করিল।

কিন্তু এ সুনাম ক্ষিতীশের অধিক দিন রহিল না। মফঃস্বলের ইতর-ভদ্র সকলেই প্রায় নব-গ্রামের লোক, দেব-গ্রামের পথে পা দেয় না; কাজেই, ঘন ঘন চাঁদার খাতা বাড়ী আসিতেই সবাই বাঁকিয়া বসিল, বলিল,—অমন পরের ধনে পোদ্দারী সকলেই করিতে পারে।

সার্ব্বজনীন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আশাতীত টাকা উঠিল; কারণ ক্ষিতীশচন্দ্র যে পেয়াদার পিতামহ! যে অনিষ্ট করিতে পারে, চিরদিন তাহারি খাতির বেশী, যে জন্য জজসাহেব অপেক্ষা একজন কনেষ্টবলের পশার-প্রতিপত্তি অনেক বেশী।

ঝিনুকগাছিতে মেয়েদের মাইনর স্কুলটি বহুকালের, কেবল স্থানীয় লোকের অযত্নে ও ঔদাসীন্যে তাহার এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছে। স্কুলঘরের চালে খড় নাই, বহুদিনের প্লীহা-ম্যালেরিয়া-জীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার রোগীর মত কাঠামোটি মাত্র খাড়া আছে; তাহারও দড়ি খুলিয়া বাঁশ-বাকারি পচিয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে; মাটির দেওয়ালের ভাঙাভাঙা মাথাগুলি ষড় ঋতুর শরাঘাতে জর্জ্জরিত বহু যুদ্ধের ফেরৎ সৈনিকের মত সগর্ব্বে নিজের সর্ব্বাঙ্গের অস্ত্রক্ষতগুলি দেখাইয়া কোনও রকমে দাঁড়াইয়া আছে। বেষ্টন-প্রাচীরটির অস্তিত্ব গবেষণা-লভ্য। স্কুলের ঘরে ও প্রাঙ্গনে ছোট বড় উইটিবি এবং কচু মান গোয়ালঘষে চর-চরি আকন্দ শিয়ালকাঁটা কালকাসিন্দা সিজু ও ফণীমনসা প্রভৃতি উদ্ভিদগণ সপরিবারে

পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলাধিকার করিতেছে; তাহাদের মধ্যে বহু জীবজন্তু ও সরীসৃপাদিও নিরাপদ ভাবিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

দেশের মাতব্বর অর্থাৎ উকীল ডাক্তার এবং মহাজনদের এদিকে দৃষ্টি দিবার নিতান্ত সময়াভাব। ইন্‌কমট্যাক্স দিবার সময়ে তাঁহারা বলেন, কাজকর্ম্ম একেবারেই নাই, সংসার চলা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপারের জন্য কিছু করিতে বলিলেই, তাঁহারা উল্টা গাহিয়া থাকেন।

জমিদারবাবুরা তো জানেনই না যে, দেশে কোনও মেয়ে-স্কুল আছে বা কস্মিন্‌কালে ছিল—কারণ, তাঁহারা চিরদিনই হয় জেলায়, নয় কলিকাতায়। দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ শুধু খাজনা লইয়া; এবং কালে-ভদ্রে যদি কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী গ্রামে আসেন তো তাঁহারাও নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার ২।১ দিনের জন্য উক্ত সাহেবের সঙ্গে করমর্দ্দন ও পার্টি করিতে আসেন মাত্র। কাজেই স্কুলটির অবস্থা বিলাসী ছেলের দুঃস্থা বৃদ্ধা জননীর মতই সকরুণ।

একবার দুইচারি জন কলেজে-পড়া ছেলে এই বিদ্যালয়টির সংস্কারকল্পে কিছু চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদের উপর মহা খাপ্পা হইয়া বলিয়াছিলেন—"একেই দেশের আবহাওয়ায় মেয়েরা এখন ক্রমশঃ এমনি অলস অকর্ম্মণ্য আর বিলাসী হয়ে উঠচে যে, তাদের সাবান সেমিজ আর স্নো যোগাতেই লোক প্রাণান্ত হয়ে পড়চে, এর উপর আবার লেখাপড়া? বলি, লেখাপড়া শিখে মেয়েরা করবে কি? কতকগুলো বাজে নাটক-নভেল আর মাসিক-পত্র পড়বে বৈ তো নয়? সে খরচ যোগাবে কে? এখুনি তাদের—লেখাপড়া না

শিখেই—এত বাবুগিরি, না জানি একখানা চিঠি লিখতে শিখলে তো আর তারা দেমাকে মাটিতেই পা দেবে না!"

ছেলেরা প্রতিবাদ করিল। অভিভাবকেরা অতিশয় বিজ্ঞভাবে কহিলেন—"তোমাদের মা মাসী ঠাকুমা দিদিমা কটা পাশ করেছিল, বাবা? তারা কি সংসার করে নাই, না এখনও করচে না? আর তাঁদের মত চৌকষ গিন্নি একজন লেখাপড়া-জানা মেয়েদের মধ্যে থেকে বের কর দেখি?"

ভটচাজ্ মহাশয় বলিলেন—"আমার দিদিমা দুর্গোৎসবের ফর্দ্দ করে দিতেন মুখে মুখে—"

গাঙ্গুলী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন—"কেন, আমার পিসী? অবাক্ হয়ে যাবে, বাবারা, হাজার লোক খাওয়াতে কোন্ জিনিষ কত লাগবে এমনি হিসাব করে দিতেন যে, কার সাধ্যি তাঁর ওপর কথা কয়—"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন—"এখনও যজ্ঞি রাঁধতে হলেই ডাক্ চকোত্তি-গিন্নিকে। কেন? লেখাপড়া-শেখা মেয়েরা পারে না?"

ইত্যাকার যুক্তির লগুড়াঘাতে ছেলের দল সেই যে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়াছে, আর কখনও ঈদৃশ দুঃসাহসের পরিচয় দেয় নাই।

ফলে, সুপ্রাচীন গুরুমহাশয়, বহুদিন হইতে স্থানীয় উকীল আদিত্যচরণ চোংদার মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ১০।১২ জন বালিকাকে লইয়া তাহাদিগকে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও ছটাকিয়া শিখাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া, কোনও রকমে স্কুলের জেরটা টানিয়া আসিতেছিলেন।

ক্ষিতীশের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই একজন হাকিম বিদ্যালয়টিকে বাঁচাইবার জন্য একটু-আধটু চেষ্টা যে না করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তবে, যে-চুল্লীতে

তাঁহারা হাওয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে ছাই ছিল প্রচুর, আগুন একটুও না থাকায়, সমস্ত ছাইগুলি উড়িয়া তাঁহাদেরই মুখে লাগিয়াছিল মাত্র, আগুন একটুও জ্বলে নাই।

ক্ষিতীশ বরাট ছাড়িবার পাত্র নহেন। জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়া, সুযশ খোয়াইয়াও বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, তিনি চাঁদা তুলিতে লাগিয়া গেলেন। জগতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে সোজা জিনিষে ঠিক আঁট হয় না, যেমন পেরেক আর স্ক্রু; পেরেকের চেয়ে স্ক্রু'র আঁট বেশী। ক্ষিতীশ ক্ষেত্রানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সুফল লাভ করিলেন।

অবিলম্বে নারী বিদ্যামন্দির উঠিল, আগাছা গিয়া ফুলের চারা পোঁতা হইল, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়িল। গুরুমহাশয় রহিলেন; ৪৫৲ টাকা বেতনে নূতন প্রধান শিক্ষয়িত্রী আসিলেন—কুমারী এণাক্ষি মল্লিক, জাতিতে বৈদ্য। বয়স বিশ কি একুশ; টক্-টকে পরিষ্কার রং, গোল গাল গড়ন, না-খাটো না-লম্বা চেহারা, চোখে চশ্‌মা, পায় দিল্লি-ওয়াল জুতা, পরণে খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউজ্, দুই হাতে সরু-সরু সোণার চুড়ি ছয় গাছি, গলায় একগাছ সুত-হার, বাম হাতের অনামিকা আঙ্‌লে দুইটি হাতের মধ্যে হরতনের টেক্কা বসান' গিনি-সোণার এক আংটী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিতান্ত জিদের বশবর্ত্তী হইয়াই ক্ষিতীশচন্দ্র এত তাড়াতাড়ি শিক্ষয়িত্রী পর্য্যন্ত আনাইয়া স্কুলের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, শিক্ষয়িত্রীর থাকিবার ঘর স্কুলবাড়ীর প্রাঙ্গনেই খুব অল্পসময়ের মধ্যেই তৈরি হইয়া যাইবে, এবং যতদিন না হয়, ততদিন তাঁহার জন্য একটা ছোটবাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু উপযুক্ত টাকার অভাবে বাড়ী তৈরী পিছাইয়া গেল এবং সুবিধামত পছন্দসই ভাড়া-বাড়ীও পাওয়া গেল না। কাজেই এণাক্ষি ক্ষিতীশের বাংলার অতি নিকটবর্ত্তী ডাক-বংলাতেই বাস করিতে লাগিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ছোট্ট শহরটি এণাক্ষির রূপের বর্ণনায় এবং নানাবিধ কল্পনায় মুখর হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ স্কুলের সেক্রেটারী, একজন ধনীপুত্র, জনৈক নব্য উকিল এবং স্কুল-কমিটির এতদিনকার ঘুমন্ত ও উদাসীন্ সভ্যগণ মেয়ে-স্কুলের উন্নতির চেষ্টায় এমন উৎসাহী হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের আহার-নিদ্রা এবং নিজ নিজ কার্য্যেও বিশেষ অবহেলা লক্ষিত হইতে লাগিল।

ত্বিষাম্পতি কুণ্ডু গ্রামের তরুণ জমিদারপুত্র, যিনি জন্মাবধি কলিকাতাতেই ছিলেন এবং পড়াশুনা ছাড়িয়াও সেইখানেই বাস করিতেছেন, গ্রামের নাম শুনিলেই ম্যালেরিয়া ধরিবে বলিয়া যাঁহার ভয় হইত, জেলাকোর্টে বৈষয়িক কাজ করিতে আসিয়া, অকারণ হঠাৎ গ্রামে আসিয়া হাজির; এক সপ্তাহ হইয়া গেল, ফিরিবার নামটি পর্য্যন্ত নাই।

প্রথমে সকলে বিস্মিত হইয়াছিল, এখন তাহারা মুখ টিপিয়া শুধু হাসে।

প্রতিদিন সকাল হইতে বেলা ৯টা, আবার অপরাহ্ন হইতে রাত্রি ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত হিতৈষিগণ ডাক-বাংলায় ভিড় করিতে লাগিলেন। ইহাদের প্রত্যহ দ্বৈকালিক, নিয়মিত কুশল-প্রশ্নের ভারে এণাক্ষি সত্যসত্যই বিপন্ন হইয়া পড়িল।

ত্বিষাম্পতি প্রস্তাব করিল, তাহাদের প্রকাণ্ড বাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে থাকিলে ইস্কুলও কাছে হয় এবং ডাক-বাংলায় থাকার কষ্ট না হইয়া, গৃহে বাস করার স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাও হইতে পারে, কিন্তু এণাক্ষি ধন্যবাদ দিয়া জানাইল যে, সে আরামেই আছে। যুবক মুখটি ম্লান করিল মাত্র, কিন্তু এই অযাচিত উপকার করিবার দৃঢ়সংকল্প হইতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না।

ত্বিষাম্পতির বাড়ী হইতে ভাল চাউল ডা'ল তরকারি মাছ ঘি প্রভৃতি আসিতে আসিতে ক্রমশ শাড়ী সাবান সুগন্ধি তৈল, এসেন্স পর্য্যন্তও আসিতে আরম্ভ করিল। একদিন একগাছি সোণার হার লইয়া, সায়াহ্নে ত্বিষাম্পতি নিজেই উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে দুই জন নগদী।

তখনও গোধূলির অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত চরণের চিহ্নগুলি গগনের পথ-প্রান্তে মিলাইয়া যায় নাই এণাক্ষি নিবিষ্টমনে ক্ষিতীশের একখানি ফটোগ্রাফের পানে চাহিয়া তন্ময় হইয়া বারান্দায় বসিয়াছিল; হঠাৎ ত্বিষাম্পতির পদশব্দে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সলজ্জিত ভাবে আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

ত্বিষাম্পতি কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কার ছবি? এমন বাহ্জ্ঞানশূন্য হয়ে—"

এণাক্ষি বাধা দিয়া কহিল, "ডেপুটিবাবুর ছবি স্কুলের জন্য আনিয়েচি—"

ত্বিষাম্পতির মুখটা হঠাৎ কালো হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল —"আমি যে একখানা আমার ফটো পাঠিয়েছিলাম—"

এণাক্ষি। আছে, সেখানা আছে—এনে দেব?

ত্বিষা। না, না, আপনার কাছে থাকবে বলেই তো—

ত্বিষাম্পতির আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এণাক্ষি চিন্তিত ভাবে অন্য দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। কুঞ্চিত কালো অলকগুচ্ছগুলি কেবল সেই তুষার-শুভ্র ললাটের উপর আছাড়িয়া পড়িয়া দোল খাইতেছিল।

উভয়েই কিয়ৎকাল নীরব।

ত্বিষাম্পতির ভিতরকার যুবক-পশুটি ব্যাঘ্রের মত শিকারের সম্মুখে লোলুপ লালসার ক্ষুধিত দৃষ্টিতে এই পরিপূর্ণ উচ্ছলিত-যৌবনা সুন্দরীর সর্ব্বদেহে কামনামদির চক্ষে নারীর রূপ দেখিতেছিল। এ বুভুক্ষিত চাহনি এত তীব্র যে, এণাক্ষির এ দৃষ্টি সহ্য হইতেছিল না, সে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল, অথচ এ রূঢ়তার দিকে ফিরিয়া চাহিতেও তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

ত্বিষাম্পতি ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, নিতান্ত বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ডেপুটিবাবু কখন্ আসেন?"

এণাক্ষি বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্রভাবে উত্তর দিল,—"তিনি তো এখানে কখনও আসেন না।"

ত্বিষাম্পতি অবিশ্বাসের সহিত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"কখনও আসেন নাই? একদিনও আসেন নাই?"

এণাক্ষি শক্তভাবে দাঁড়াইয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তেমনি দৃঢ়ভাবেই কহিল—"আমি আসার পর থেকে তিনি এখানে একটী বারও আসেন নি! কেন বলুন তো?"

ত্বিষাম্পতি যুবতীর এই তেজোগর্ভ প্রশ্নে একটু থতমত খাইয়া গিয়া কহিল,—"না, না, তাই জিজ্ঞাসা করচি, যাক্, এখন তোমার সঙ্গে, মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল, তা আজ দেখচি আপনার মনটা ভাল নেই, অন্য আর একদিন আসব। এখন এইটে—এই দিকে একটু আগিয়ে আসুন না দয়া ক'রে—এইটে আপনাকে আমার মত অযোগ্য একজন বন্ধুর ক্ষুদ্র উপহার—"

এণাক্ষি এক নজরে হারগাছটী দেখিল কিন্তু এক পাও অগ্রসর হইল না, কোনও আনন্দও প্রকাশ করিল না। কঠিনভাবে সে কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, বড় বড় কালো দুটী চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, মুখের কথা, মুখেই আটকাইয়া রহিল। সে ঝড়ের মত ছুটিয়া আপনার শয়নকক্ষে গিয়া সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ত্বিষাম্পতির মুখখানি হঠাৎ মসীলিপ্ত হইয়া গেল। হতভম্বের মত বাক্সসমেত হারগাছটী হাতে করিয়া সে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, শেষে হতাশ হইয়া "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং" ভাবিতে ভাবিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত দুয়ার বন্ধ দেখিয়া এবং যথাসময়ে কুকারে আঁচ দিয়া, বাংলার চৌকিদার এণাক্ষির রুদ্ধ দুয়ারে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া জানাইল যে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ এবং আঁচ জ্বলিয়া যাইতেছে।

ভিতর হইতেই ভারী গলায় এণাক্ষি হুকুম দিল, আঁচ নিভাইয়া দিতে। আজ আর সে রাঁধিবে না, শরীর অসুস্থ।

প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল, এণাক্ষি ঝিনুকগাছি আসিয়াছে। ইহার মধ্যে বহু লোক তাহার সহিত অপ্রার্থিতভাবে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বহুদিন পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু এণাক্ষির উক্ত সব ভদ্রলোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-স্থাপনে তাদৃশ কোনও আগ্রহ বা উৎসাহ না দেখিয়া, একে একে সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়াছে, দেয় নাই কেবল ত্বিষাম্পতি।

কলিকাতার বাহিরে কোনও স্ত্রীলোককে একাকিনী পুরুষ অভিভাবকহীন হইয়া থাকিতে এবং মুখ খুলিয়া ঘুরাইয়া শাড়ী পরিয়া জুতা পায় দিয়া দিবসে সদর রাস্তা দিয়া অকুতোভয়ে চলিতে দেখিলেই, পল্লীগ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই তাহাকে হয় খৃষ্টান, নয় ব্রাহ্ম, নয় আর কিছু ঠাওরাইয়া লয়, ইহাই তাহাদের চিরন্তন অভ্যাস এবং স্বভাব। তাহারা 'হাঁ' করিয়া বিস্মিতভাবে চাহিয়া দেখে, এবং মনে মনে সেই নারীর সম্বন্ধে নিজের মনোমত অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া লয়।

অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধগণ সাবেকীর দোহাই দিয়া নাক সিঁটকাইয়া ঘৃণা ভরে বলেন,—মেলেচ্ছো ; কম বয়সী নবীনেরা আহারনিদ্রা ভুলিয়া, তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে উত্যক্ত ও সময় সময় বিপন্ন করিয়া তুলে ; পল্লী রমণীগণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হন। সে রমণী যে ভাল, তাহাদেরই পুরাঙ্গনাদের মত ভদ্র ও পবিত্র, এ-কথা কেহই সহজে স্বীকার করিবে না, স্বীকার করিলেও বিশ্বাস করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে না। অথচ ইহারাই পাড়াগাঁয়ের সব কর্ত্তা ব্যক্তি সমাজপতি এবং উল্লেখযোগ্য ভদ্র সজ্জন।

এণাক্ষিরও ঠিক সেই দুর্দ্দশাই ঘটিল। হতাশ বন্ধুগণ তাহার সম্বন্ধে অনেক কথাই রটাইল এবং ত্বিষাম্পতিকেও সেই উপন্যাসের সঙ্গে জড়াইয়া ব্যাপারটাকে শুধু যে জটিল করিয়া তুলিল, তাহা নহে, বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপকও করিয়া ফেলিল। আরও কয়েক দিন পরে ত্বিষাম্পতির নৈরাশ্য ও হতাশ প্রেমের কাহিনী অবগত হইয়া লোকের আর কোনও সন্দেহই রহিল না যে, এণাক্ষির সহিত ক্ষিতীশচন্দ্রের যে একটা গোপন সম্বন্ধ আছে সেটা পূর্ব্বাবধিই ছিল।

একজন বড় লোকের সম্বন্ধে কোনও গুজব, খড়ের গাদায় আগুনের মত দেখিতে দেখিতে ছড়াইয়া পড়ে। ব্যর্থ শিকারিগণের উদ্যোগে কথাটা গ্রামের মুরুব্বীদেরও কাণে গেল।

ডাক্তার আদ্যনাথ মালখণ্ডী বলিলেন—"ঐ জন্যেই তো বাপু, গোড়াগুড়ি আমি এ স্কুলের বিপক্ষে ছিলাম। এ যে হবে, তা আমরা অনেক আগেই জানতাম। তখন তো আমাদের ওল্ডো ফুল্‌ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলে, এখন ঠেলা সামলাও। এই ছোট শহরটিতে হিন্দু

সমাজের মুখের ওপর—কেমন? কেমন চুণকালি? এইবার নিজেদের ঘরবাড়ী সামলাও গে যাও—যাও—"

প্রাচীন মোক্তার সদানন্দ ভটচাজ বলিলেন—"একেই বলে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া! আমাদের টাকায় স্কুল করে, হাকিম আনলেন তাঁর—"

শ্রেষ্ঠ উকীল কেনারাম গাঙ্গুলী ভটচাজ মহাশয়ের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আরে, আস্তে আস্তে, খুড়ো, এখন আর পস্তালে কি হবে? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন—"

কুড়োরাম চক্রবর্ত্তী দেশের একজন বড় ব্যবসাদার; ব্যবসার চেয়ে তাঁহার স্থদী টাকার কারবারটার চল্‌তিই বেশী, গভীর গবেষণা করিয়া বলিলেন—"চাঁদা আদায় করবার সময় কি রকম জুলুমটা হয়েছিল মনে আছে? ঘর পিছু পাঁচ টাকা! বাপ—এক মাসের বাজার খরচ! একেই বলে, বুকে বসে দাড়ি ওপ্‌ড়ানো! ঐ যে ক'টা ছুঁড়িটা, আমার বাড়ীর দোর দিয়ে রোজ ছ'বেলা ঠমকে-ঠমকে যায়, ওকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে পুড়ে যায়। ভদ্রলোকের ঘরে ভদ্রলোকের মেয়ে কি আর চাকরী করতে বেরোয় রে, বোকা? আমাদের দেশে কি আর ভদ্দরলোক নেই, না আমরা ভদ্দরলোক দেখি নাই? গরীব ব'লে কে কবে ঘরের যুবতী মেয়েকে চাকরী করতে পাঠায়, দেখাও দিকিন?"

গৌরহরি গোস্বামী-প্রভু হরিনাম করিতেছিলেন; দেশে তিনি বিশেষ মান্য; প্রগাঢ় পণ্ডিত, ধর্ম্মাত্মা ও সদাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ; হাতে সর্ব্বদাই হরিনামের মালা, সর্ব্বাঙ্গে জপমন্ত্র, অনেক বড় বড় লোকের তিনি মন্ত্র-গুরু, সম্প্রতি ৫৩ বৎসরে তৃতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন,

কহিলেন—"আমাদের এত আপত্তি সত্ত্বেও, সাত-তাড়াতাড়ি স্কুল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যখন শিক্ষয়িত্রী আসবার কথা হলো, তখনি আমার মনে কেমন একটা সন্দ হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের মত দেশের ও দশের মাথারা যখন এতে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তখন আমি আর অমত করে কেন একটা সৎকার্য্যে প্রতিবন্ধক হই, তাই কিছু বলতে ভরসা পেলাম না। ব্যাপারটা বুঝুন না—রিপুজয় করে ব্রহ্মচর্য্যপালন করা কি অমনি সহজ কথা? মুনি-ঋষিরাই বড় পারতেন—তা এই কদাচারী ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন ম্লেচ্ছ-স্বভাব মানুষ। এ রকম কেলেঙ্কারী করার চেয়ে উনি একটা বিবাহ করুন না কেন? বয়সও তো এমন কিছু হয় নাই এখনও, আর তা না করেন গণিকার মতই ওকে রেখে দিন,—এ রকমটা না করাই উচিত—"

ক্ষিতীশচন্দ্র বিপত্নীক। প্রায় তিন বৎসর হইল একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া, তাঁহার স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিলে, তিনি আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা মাতা। এখন পুত্রের বয়স পাঁচ ও কন্যার তিন। মাতাই পুত্রের এই মাতৃহীন সন্তান দুইটিকে মানুষ করিতেছেন। তিনি বহু অনুরোধ উপরোধ করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষিতীশ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে কিছুতেই রাজী হন নাই, কাজেই তাঁহাকে ক্ষিতীশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতে হয়, ক্ষিতীশের ছোট ভাই দীনেশ আসামে আবকারী বিভাগে বড় কর্ম্ম করে, সপরিবারে সে সেইখানেই থাকে। একমাত্র ছোট ভগিনী সরযূ, সে তাহার স্বামীর নিকট এলাহাবাদে থাকে; তাহার স্বামী সেখানে উকীল।

সরযূ প্রথম সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকাগারে অত্যন্ত পীড়িত, এই

সংবাদ পাইয়া ক্ষিতীশ এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া ভগিনীকে দেখিবার নিমিত্ত এলাহাবাদ গিয়াছেন; এই অবসরে গুজবটি এমন বিস্তৃতি-লাভ করিল যে, খবরটি ক্ষিতীশের জননীর কর্ণেও. আসিয়া পৌঁছিল। মাতা এণাক্ষির উপর চটিয়া আগুন হইয়া গেলেন!

স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতেই ক্ষিতীশ গৃহে খুব কম সময়েই থাকিতেন। তাঁহার গৃহের ও অন্তরের নিঃসীম শূন্যতা এবং নিঃসঙ্গতাটাকে তিনি অবিরত বাহিরের অনাবশ্যক কাজে, অকারণ আবেষ্টনে এবং পরিত্যাজ্য প্রয়োজনে ভরাট করিবার জন্য কেবলি নিজেকে ছ্যাকড়া-গাড়ীর ঘোড়ার মত চাবুকের উপর চাবুক মারিয়া খাটাইতেন। কিন্তু তবুও যেটি ভুলিয়া থাকিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, সেটা কিছুতেই ভুলিতে না পারিয়া, সর্ব্বদাই গুমরিয়া গুমরিয়া অশ্রুপাত করিতেন। জোর করিয়া কি ভোলা যায়, না অন্তরের ক্ষত বাহিরের প্রলেপে সারে?

মা কিন্তু পুত্রের কার্য্যকলাপ কিছুই আলোচনা করিলেন না; এই খবরটি শুনিবামাত্রই পুত্রের অধঃপতনে এমনি মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল এণাক্ষির উপর। ক্রমাগত এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারও বিশ্বাস হইল, এই মায়াবিনীই তাঁহার পুত্রকে কুহকজালে আচ্ছন্ন করিয়া এমন ভুলাইয়াছে যে, ক্ষিতীশ আজকাল একদণ্ডও বাড়ীতে বসে না, তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ পর্য্যন্ত করে না। পুরুষের মনে স্ত্রীলোকের মোহ—সাংঘাতিক। তাহাতে উভয়েরই পূর্ণ যৌবন, স্বরূপ, উভয়েরই নিটোল স্বাস্থ্য, অবাধ স্বাধীনতা!

মাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। খুব সকাল সকাল পূজাহ্নিকাদি সারিয়া, গরদের কাপড়খানি পরিয়া, তিনি আস্তে আস্তে তাঁহাদের গৃহের অতি নিকটবর্ত্তী ডাক-বাংলায় আসিয়া হাজির।

হাকিমের মাকে এত সকালে অপ্রত্যাশিতভাবে এস্থানে দেখিয়া, চৌকিদার দৌড়াইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই, তিনি সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে খৃষ্টানী মাষ্টারনী কোথায় থাকে?"

চৌকিদার কক্ষ দেখাইয়া দিয়া, থতমত খাইয়া, নিবেদন করিল—"তেনা এখন শিবপূজো কচ্চে—"

"শিবপূজো!" হাকিম-জননী আকাশ হইতে পড়িলেন।

"এজ্ঞে হেঁ, কত্তামা ঠাকরুণ্—শিবপূজো। তেনা এ রোজ সকালে করেন—"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, দাঁতে দাঁতে পিষিতে পিষিতে নিজের মনেই কহিলেন—"আ মর্ খৃষ্টানি—ঢং দেখে বাঁচি না, আবার লোক-দেখানো শিবপূজো হয়! জাত ভাড়িয়ে, নচ্ছার মাগীর হিঁদুগিরি ফলান হচ্ছে—গরু-শূয়োর-খাগী রাক্কুসী খৃষ্টান্—"

চৌকিদার বাধা দিয়া কহিল—"না কত্তাঠাকরুণ্, তেনা খিরিষ্টান্ নয়, হিঁদুই বটে! মাছ কি পেঁয়াজও তেনা কিছু খায় না—লিজে র‍্যেঁদে লেয়, লিত্যই লেয়ে, লিজে এষ্টোবে ক'রে য়াঁদে—গুরুমা নোকটাও খুব সরেশ—"

মাতার বিস্ময় সপ্তমে উঠিল; হঠাৎ রাগটাও যেন একটু কমিল। নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার ছেলে এখানে বেড়াতে আসে না?"

চৌকিদার মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, শহরের সব বাবুদিগকেই এখানে পাঁচ সাত দশ দিন আসিতে দেখিয়াছে, কিন্তু হাকিমকে সে কখনও দেখে নাই; তিনি একদিনও এখানে আসেন নাই।

মাতা ভাবিলেন, ইহাও কি সম্ভব? যাহা রটে, তাহার কিছুও ঘটে। লোকে কি এতবড় একটা হাকিমের নামে অমনি মিথ্যে কথা রটাতে পারে? জেলের ভয় নাই? এ চৌকিদারটা নিশ্চয়ই কিছু পাইবার লোভে এবং হাকিমের ভয়ে এমন মিথ্যা বলিতেছে!

ক্ষিতীশের জননীর চিন্তা-স্রোতে হঠাৎ বাধা পড়িল; মুখ তুলিতেই দেখিলেন, সদ্যস্নাতা আনিতম্বলম্বী কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ আলুলায়িত বিশাল কেশদাম, টক্-টকে চওড়া লাল-পাড় একখানা তসরের শাড়ী-পরিহিতা, গললগ্নিকৃতবাসে এণাক্ষি পিতলের ছোট একটি সাজিতে কতকগুলি জবাফুল ও বেলপাতা সমেত সদ্যপূজিত মাটির শিবলিঙ্গটিকে বাংলার প্রান্তবাহিনী নদীবক্ষে ভাসাইয়া দিতে বাহির হইল—যেন অকস্মাৎ পূর্ব্বগগনে মূর্ত্তিমতী ঊষার উদয়! মুখে একটা অনির্ব্বচনীয় আলোক, চোখে নিষ্পাপ চাহনি, গতিতে স্বচ্ছন্দ মাধুর্য্য!

এণাক্ষি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা—এ সময়! আমার কি সৌভাগ্য যে আজ সকালে আমার কপালে আপনার শ্রীচরণ দর্শন লাভ হ'ল? মা, একটু উঠে দাঁড়ান্—আমি একবার নদীর ঘাট থেকে আস্‌চি পাঁচ মিনিটে—এলুম বলে—"

এণাক্ষি একরকম ছুটিতে ছুটিতেই চলিয়া গেল। গিন্নির সব ওলোট-পালট হইয়া গেল! তিনি নিজের কথা স্মরণ করিয়া নিজেই লজ্জায়

হেঁটমাথা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে এণাক্ষির উপর সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও স্নেহের বসন্ত-পূর্ণিমা জাগিয়া উঠিল।

এণাক্ষি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া ভক্তিপূর্ণ ভাবে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া গিন্নির পদধূলি লইয়া, তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসু ভাবে দাঁড়াইল। ভাবাতিশয্যে তখন ক্ষিতীশ-জননীর মুখ চোখ বহিয়া দরদর-ধারে অশ্রু বহিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্ষিতীশ গৃহে ফিরিয়াই পুত্র প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, তাহার এক নূতন পিসীমা আসিয়াছে, অর্থাৎ এণাক্ষি ডাক-বাংলার বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিতেছে। পুত্র বলিল, পিসীমা তাহাকে বড্ড ভালবাসে অনেক খেলানা দিয়াছে, অনেক গল্প জানে এবং তাহার ও খুকীর জন্য খুব ভাল ভাল জামা শেলাই করিতেছে। সে এখন পিসীমাব কাছেই রাত্রে শয়ন করে। পুত্র পিতাকে আরও চমৎকৃত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি নূতন পিসীমার নিকট শেখা—"তরুণ শকলমিন্দোবিভ্রতী শুভ্রকান্তি" শ্লোকটি পর্য্যন্ত মুখস্থ শুনাইয়া দিল। ক্ষিতীশ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে নূতন পিসীমার অনেক কথা যেমন শুনিল, অনেক কার্য্যও তেমনি দেখিলেন; তাহার ঘরটি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—যে-টি যেখানে থাকিবার সেটি সেখানে, ধুতিটি কোঁচান, তোয়ালেটিতে সাবান্ দেওয়া, আয়নাটি মোছা, বইগুলি সাজানো, মশারির ছোট ছোট ছেঁড়াগুলি রিফু করা, পেন্সিলগুলি কাটা, বাজে কাগজের টুকরিটি খালি, জুতাগুলি কালি-দেওয়া, বিভিন্ন মাসিক-পত্রগুলি র‍্যাকে আলাদা আলাদা মাসহিসাবে সারিকরা সাজানো! ক্ষিতীশের মনে পড়িল, গত তিন বৎসরের মধ্যে তাহার ঘরের শ্রী এরূপ একদিনও হয় নাই, অনেক বলিয়া কহিয়া বকিয়াও হয় নাই। অথচ আজ না বলিতেই হইয়াছে। প্রথম ক্ষিতীশ গৃহসংস্কার দেখিয়া যেটুকু

খুশী হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাপেক্ষা সে অনেক বেশী বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তাহার মনে একসঙ্গে দুইখানি সুন্দর মুখ ফুটিয়া উঠিল, একখানি মৃতা স্ত্রীর, অন্যখানি এণাক্ষির। ক্ষিতীশের ভিতরকার পত্নীগতপ্রাণ স্বামীর সহিত যৌবন-শতদলবাসী পুরুষের দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। এ মল্লযুদ্ধে স্বামীরই জয় হইল।

তখনও এণাক্ষি স্কুল হইতে ফেরে নাই, ক্ষিতীশ দিবানিদ্রার পর হাত মুখ ধুইয়া বসিলে, জননী আসিয়া গুজব শ্রবণ হইতে এণাক্ষির সহিত তাঁহার নিবিড়ভাবে পরিচয় এবং তাহাকে গৃহে স্থানদান পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক যথাযথভাবে পুত্রসকাশে সবাহুল্যে বর্ণনা করিলেন।

ক্ষিতীশ সব শুনিয়া কহিলেন—"বুঝলাম, তবু ওঁকে আমার বাসায় আনা তোমার ঠিক হয় নি, মা—তুমি বুঝ্‌চ না, এতে আরও একটা বিশ্রী কথা রট্‌তে পারে! অবিশ্যি আমি নিজের জন্য কিছু ভাবি না, কারণ আমি জানি, আমি কি করি না করি—আমি ভাবি শুধু ঐ ভদ্রকন্যার জন্যে! ওঁর যদি এমন একটা বদ্‌নাম হয়, তাতে ওঁরই সমূহ ক্ষতি—"

মা বলিলেন—"আমার কাছে থাকলে আর ওর বদ্‌নাম কিসের? এখানকার লোকগুলা সব হতভাগা, অত্যন্ত ইতর; এমন সব বেয়াদব যে, মেয়েটাকে একেবারে ত্যক্তবিরক্ত করে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে ফেলেছিল! হারামজাদাদের কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান যদি থাকে! এরা আবার এখানকার ভদ্রলোক!"

ক্ষিতীশ।—অধিকাংশ ভদ্রলোকই এই প্রকৃতির, মা। এ ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যায়। কিন্তু ওঁর উচিত ছিল, এ সব লোকেদের প্রশ্রয় না দেওয়া, কিম্বা আমায় সব জানানো! উনি যদি ঐ রকম

ষাড়তে না দিতেন, তা হ'লে এদের সাধ্য কি ? ওদের দোষ আমি তত দিই না—”

মা চটিয়া উঠিয়া কহিলেন—“এই বুঝি তোমার বিচার হল ? যে ভদ্রলোক সেজে আলাপ্ করতে আসে, একটা ভদ্রলোকের মেয়ে, তাকে কখনও অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারে ? এরা লেখাপড়া শিখেচে, ছেলেবেলা থেকে স্বাধীন ভাবে বেড়িয়েচে বলেই না অমন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পারে। কৈ আমি পারি কি ? আমার যে তিনকুড়ি বছর বয়স হতে চল্‌ল। লোকজনের কাছে বসে বলেই কি তারা ওকে অপমান করবে ? ভদ্রলোকের মেয়ের মান রেখে কথাবার্ত্তা কইবে না ?”

ক্ষিতীশ।—মা, তুমি যখন যেটা ঝোঁক ধর, তাই করে বস'। আজ কালকার দিন-সময় ত কিছু বোঝ' না ! আজকাল হচ্ছে ঠকেরই বাজার ! এ মেয়েটা কি জাত, কার মেয়ে, কোথা বাড়ী, কেমন স্বভাব-চরিত্র কিছুই আমরা জানি না। ওঁর মনে মনে যে কি মৎলব, তা' জগদীশ্বরই জানেন। ওঁকে কি পরিবারের মধ্যে চট্ করে স্থান দিতে আছে ? ওঁকে এখানে আর রেখ না মা, উনি ঐ ডাকবাংলাতেই থাকুন্। না থাকে, কাজে ইস্তফা দিয়ে, যেখানে খুসী চলে যাক—”

মা।—কিন্তু বাবা গরীবের মেয়ের কি ধর্ম্ম নেই, ইজ্জৎ নেই ? চলে যাবে বলে' তো ও এখানে আসে নি ! দেশের লোক যে ওকে ভিটে-ছাড়া কর্‌চে, তার কি কোন উপায় তুমি কর্‌তে পার না ? তবে তুমি কিসের হাকিম ? ঐ জমিদারের ছেলে না কে, কে এক ত্বিষাম্পতি কুণ্ডু আছে, তার জ্বালায় তো ও অস্থির—

ক্ষিতীশ।—কেন, সে আবার কি করলে? সেটা ত একটা এক নম্বরের পাজী! তার অনেক কীর্ত্তিই ত' আমি জানি, সেও এখানে জুটেচে নাকি?

ত্বিষাম্পতিসংক্রান্ত সমস্ত কথা, এণাক্ষির নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, মা সব বলিয়া জানাইলেন যে, তাহার প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্যাদি ডাক-বাংলার একটা ঘরে এখনও ঠিক সেই অবস্থাতেই পড়িয়া আছে, এণাক্ষি তাহার কণামাত্রও গ্রহণ করে নাই। অথচ একজন ভদ্রলোক, দেশের জমিদার তাহার দান প্রত্যাখ্যানও তো সে সহজে করিতে পারে না। এ মেয়েটার যে উভয় বিপদ। শেষে সেই ব্যক্তিই, সে দিন সন্ধ্যায় একগাছা সোনার হার এবং দুই জন নগদী লইয়া আসিয়া তাহাকে অপমান করিতে উদ্যত হওয়ায়, সে ঘরে গিয়া খিল দিয়া তবে আত্মরক্ষা করে।

এই কথা শুনিবামাত্র ক্ষিতীশের রমণীটির উপর একটু শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। নিঃসহায় রমণীর উপর নির্য্যাতন—তাঁহার রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল।

মা কহিতে লাগিলেন···"যাই হোক ছেলেমানুষ তো; ওর বুদ্ধি বিবেচনাই বা কতটুকু? প্রথমে সে বদমাইসটাকে ত' চিন্‌তে পারে নি, এই যা তার দোষ! তবে ও বললে যে, গরীব বলে সে ছোঁড়াটা ওকে চাল ডাল ঘি তেল পর্য্যন্ত পাঠাতো, তাতে ওর মনে ভারী কষ্ট হতো, তাই সেগুলোও সে খুসী হয়ে গ্রহণ করতে পারে নি! আমি ওকে অনেক জেরা করে, দেখে শুনে তবে বাড়ীতে এনেচি। অমনি কি ঘরে ঠাঁই দিই বাবা? আমি কি কিছু বুঝি না?"

মায়ের সহানুভূতি ক্রমশঃ ক্ষিতীশের অন্তরেও সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ভাবিলেন, বাস্তবিকই সাধারণের অর্থে বেতনভুক হইয়া সাধারণকে অবজ্ঞা করাও বড় সহজ নহে। একজন সাধারণ শিক্ষয়িত্রী তো সে? আর অন্য দিকে জমিদার উকীল প্রভৃতি ভদ্রলোক।

পুত্রকে নীরবে দেখিয়া মা ভাবিলেন, ছেলের দয়া হইয়াছে। মা কহিতে লাগিলেন,—"আজ চার দিন হল মেয়েটী এসেচে, আমি বেঁচেচি! বাড়ীতে এমন একটী লোক নেই, যার সঙ্গে একটা কথা কই! মনের সঙ্গে কথা ক'য়ে ক'য়ে দেহ আর দেহ নাই। আহা মেয়ে তো নয় যেন লক্ষীঠাকরুণ, পটের সুন্দরী, আট অঙ্গে কি কোনও খুৎ নেই! এমন সুন্দরী মেয়ে তো কখনও দেখিনি। বৌমা সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু এ তার উপরও টেক্কা দিয়েচে। যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি ঘরকন্নার কাজে, তেমনি পূজো আর্চ্চায়! রোজ সকালে নেয়ে, শিব পূজো না করে মেয়ে জল গ্রহণ করে না, মাছ মাংস পেঁয়াজের হাঁড়িতে পর্য্যন্ত খায় না। আর কাজে কি এতটুকু আলিস্যি নেই? ও এসে অবধি, ঐ তো ঘর-সংসার সব দেখচে, আমার পূজোর ঠিক করা থেকে, রান্নার যোগাড় থেকে, তোমার ঘর গোছান থেকে, ছেলে মেয়েদের নাওয়ানো খাওয়ানো পর্য্যন্ত সব তো ঐ করচে, আমায় নড়ে কুটোগাছটী পর্য্যন্ত নাড়তে দেয় না। যতই হোক্, বদ্দির মেয়ে তো? ওকে তাই আমি মেয়ে বলেচি—ও আর-জন্মে নিশ্চয় আমার মেয়ে ছিল।"

ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"ওদের বাড়ী কোথায়?"

মা বলিলেন,—"বাড়ী ওদের ছিল বীরভূম জেলায়। ওর বাপ কোন্ ইস্কুলে মাষ্টারী করতো, ছেলে বেলায় মা মরে যায়। বাপ আর বিয়ে থাওয়া করে নি, মেয়েটিকে নিয়েই কষ্টে স্বষ্টে থাকত। মেয়ের বয়স

যখন ১৩।১৪ তখন এক বিয়ের সম্বন্ধ হয়, কোথায় কাদের সঙ্গে, তা ও ঠিক বলতে পারে না, তবে এইটুকু শুধু ওর মনে আছে যে, বিয়ে করতে এসে বরপক্ষ টাকার গোলমাল করে বর উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। সম্প্রদান আর হতে পায় নি। বাপ সেই দুঃখে আত্মহত্যা করে। ওকে তারপর সেই গাঁয়ের বাবুরা কলকাতার এক অনাথ-আশ্রমে রেখে আসে। সেখান থেকে লেখাপড়া শিখে, এই সবে প্রথম চাকরী করতে বিদেশ বেরিয়েচে—"

ক্ষিতীশচন্দ্র নিবিষ্ট চিত্তে সব শুনিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ, ঠিক, 'আনন্দময়ী আশ্রম' থেকেই দরখাস্ত করেছিল বটে। ও আশ্রমটাও আমি জানি, ওখানকার বন্দোবস্ত খুব ভাল। সেবার বরিশাল থেকে ছোট একটী বাপ-মা মরা মেয়েকে আমি ঐখানেই রেখে এসেচি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্ষিতীশ জননীকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু তাঁহার যুক্তি টিঁকিল না। এণাক্ষির ক্ষিতীশের বাসাতে থাকাই সাব্যস্ত হইল। এণাক্ষিও সব শুনিয়া বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল, সে-ও পুনরায় ডাক-বাংলাতেই থাকিবে স্থির করিল কিম্বা একটা বাড়ী ভাড়া লইতেও অগত্যা রাজী হইল কিন্তু জননী এমন আপত্তি তুলিলেন এবং খোকাখুকি দুটিতে এমন করিয়া এণাক্ষিকে জড়াইয়া ধরিল যে, শেষে ক্ষিতীশই বাধ্য হইয়া এণাক্ষিকে যতদিন তাহার বাড়ী তৈরী না হয়, অন্তত ততদিন তাঁহার গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

মাতা ও মাতৃহীন শিশু দুইটির নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ক্ষিতীশ সমস্ত অসত্য অপবাদ মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। মনে মনে বলিলেন, লোকের কথায় কি হয়? তাঁহার মত শক্ত মন কাহার? তুচ্ছ এণাক্ষি অমন সহস্র সহস্র রূপসী আসিলেও তাঁহাকে পত্নী-স্মৃতির দুর্ভেদ্য দুর্গ হইতে এতটুকু বিচ্যুত করিতে পারিবে না। নিজের উপর এতখানি বিশ্বাস, এতটা নির্ভর করিয়া, দুষ্ট লোকের কবলগত নিঃসহায়া একজন সুন্দরীকে রক্ষা করিবার জন্য পুরুষোচিত দুঃসাহসিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের আত্মপ্রসাদে ক্ষিতীশ মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীর বাড়ীটি যাহাতে অতি সত্বর শেষ হয়, তাহার জন্য স্কুল কমিটিকে জোর তাগিদও দিতে আরম্ভ করিয়েন।

সাধারণ লোক বলিল—"নাও এইবার কি করবার কর' ?"

রমণী-বিজয় যুদ্ধে পরাজিতের দল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, কহিল, তাই তো। মাল তো গুদামজাত হয়ে গেল! হায় হায় হাতে পেয়ে এমন জিনিষটা হারালাম! এমন বাড়া-ভাতে ছাই পড়ল? এখন উপায়?

যেখানে সন্দেহ, সেইখানেই গুজব; এখন আর সন্দেহ রহিল না, কাজেই গুজবও অনাহারে শুকাইতে শুকাইতে ক্রমে ইন্ধনহীন আগুনের মত একদিন নিভিয়া ছাই হইয়া গেল।

সুতরাং চক্রান্তের পালা সুরু হইল। ইহার অধিকারী হইল ত্বিষাম্পতি কুণ্ডু। সে বলিল,—'যত টাকা লাগে, যা থাকে কপালে, ঐ রমণীটি তাহার চাইই। ইহার জন্য ডেপুটিশা—কে হত্যা করিতেও প্রস্তুত, ফাঁসি যাইতেও সে পশ্চাৎপদ নহে।' ওসমানের দল পরামর্শ দিল, ক্ষিতীশকে সরাইতে পারিলেই, এ যুবতী তাহাদের হস্তগত হইবে। সদরে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাণে পৌঁছিল, ক্ষিতীশ ইস্কুল মিষ্ট্রেসকে নিজ বাসায় রাখায় লোকে ইস্কুল ও হাকিম উভয়ের উপরই বিশ্বাস হারাইয়াছে।

ক্ষিতীশচন্দ্র সব খবরই পাইতেন, ইহাও যথা সময়ে পাইলেন। জননীকে এবং এণাক্ষিকেও তাহা জানাইতে না জানাইতেই ক্ষিতীশের কলিকাতায় বদলির হুকুম আসিয়া পৌঁছিল।

মাতা অশ্রুসজল-নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হলে ক্ষিতু, মাকে আমার এ শত্রু-পুরীর মধ্যে রেখে কি করে আমরা যাব?"

এণাক্ষি কহিল—"আমিও বেশী দিন এখানে থাকচি না, মা, আমিও আজ ইস্তাফা দিয়েচি—"

ক্ষিতীশ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"এ কি করলেন? কেন আপনি ইস্তফা দিতে গেলেন? এতে লোকে বলবে, আমিই আপনাকে কাজ ছাড়তে বাধ্য করেচি—"

এণাক্ষি স্থির সংযত ভাবে উত্তর দিল,—"লোকে তো অনেক কথাই বলেচে, এটাও না হয় বলবে। তাতে এত ভয়ই বা কিসের! ক্ষতিই বা কি? এখানে যখন আর থাকবই না তখন—"

ক্ষিতীশ বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা' বটে—কিন্তু হঠাৎ চাক্‌রীটা ছাড়বেন? তা' এখন চাক্‌রী ছেড়ে কোথায় যাবেন ঠিক করেচেন? কি কর্‌বেন?"

এণাক্ষি কহিল—"কোথায় যাব, কি করব—তা এখনও ঠিক করি নি, তবে এখানে যে থাকব না এটা ঠিক। অনেক দিন আগেই চলে যেতুম, কিন্তু মাকে আর খোকা-খুকীকে ছেড়ে যাব'-যাব' করেও এতদিন যেতে পারি নি; এইবার সে বন্ধনটাও তো খস্‌ল—"

মাতা কহিলেন—"হাঁ মা, তা হ'লে আমাদের সঙ্গেই চল না? তুমি বন্ধন খসাতে চাইলে, আমি তা খসাতে দেব কেন? আর তোমার দাঁড়াবার স্থান যখন কোথাও নেই—তখন কোথায় গিয়ে, আবার কি বিপদে পড়বে? তা' হবে না—তোমায় আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে। ক'লকাতায় তোমার একটা ভাল কাজ যোগাড় করে দিয়ে, তোমায় থিতু করে দিলে তবে, আমি নিশ্চিন্তি হ'তে পারব—লক্ষ্মীমা, অমত করোনা।"

এণাক্ষি জননীর পদধূলি লইয়া, গদগদ কণ্ঠে কহিল—"মা, আপনার পায়ের ধূলোর আশীর্ব্বাদে, এবার আমি অনেক শিখেচি, আর কোনও বিপদ আমার হ'তে পারবে না। আপনাদের কাছে আমি যে কত ঋণী,

তা' কথায় প্রকাশ করে বল্‌তে অক্ষম। আমার অন্তরের কথা, অন্তর্যামীই জানেন। এখানে আমার মন বাঁধা থাকল'—তবে দেহটাকে আমায় অন্যত্র নিয়ে যেতেই হবে, আপনার দুটি পায় ধরি, মা, আমায় ও-অনুমতি কর্‌বেন্ না, দোহাই আপনার—"

মাতা সখেদে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন মা, তোমার আপত্তিটা কিসের ? তোমার কি কোনও কষ্ট হয় এখানে ?—"

এণাক্ষি তাড়াতাড়ি সলজ্জিত হইয়া বাধা দিয়া কহিল—"ওকি কথা মা ? কেন আমার পাপের বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনার মেয়ে যত মন্দভাগিনীই হোক্, সে অকৃতজ্ঞ নয়, মা ! এখানে এসে আমি যা' পেয়েছিলুম, তা' আমার স্বপ্নাতীত, যা' জীবনে কখনও কোথাও পাইনি, হয়ত আর পাবও না। তবু আমায় এ সুখের স্বর্গ থেকে বিদায় নিতেই হবে—"

মাতা হতাশভাবে কহিলেন—"বুঝলাম না, মা—কি তোমার ইচ্ছে, যা' ভাল বোঝ কর' মা ; বল্‌লে তো তোমরা কেউ আমার কথা শুন্‌বেনা"—বলিতে বলিতে সাভিমানে তিনি চলিয়া গেলেন।

এণাক্ষিকে মাতার অনুসরণ করিতে উদ্যত দেখিয়া ক্ষিতীশ কহিলেন—"আপনার কি এখন তাড়াতাড়ি কোনও কাজ আছে ?"

এণাক্ষি দাঁড়াইয়া নত নয়নে শান্তভাবে উত্তর দিল—"না।"

ক্ষিতীশ—তবে একটু দাঁড়ান্ দয়া করে'—আপনাকে দু'একটা কথা আমার বল্‌বার আছে।

এণাক্ষি তদ্রূপ ভাবেই কহিল—"বলুন্! তা' এত 'কিন্তু' করচেন কেন ?—"

লোকে সদর দরজা বন্ধ করিয়া শয়নঘরে শক্ত করিয়া খিল দিয়া নিজেকে নিরাপদ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়, তবু ঘরে চুরি হয়। গৃহস্থ প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে সর্ব্বস্ব হারাইয়া তবে জানিতে পারে যে, গতরাত্রে সিঁদ কাটিয়া ঘরে চোর ঢুকিয়া সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়াছে। ক্ষিতীশচন্দ্রেরও ঠিক সেই অবস্থা। আজ এই সম্ভাবিত চির-বিচ্ছেদের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনিও বুঝিতে পারিলেন যে, এই কয় মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে এণাক্ষি স্বভাবে চরিত্রে সেবায় যত্নে স্নেহে মমতায় ঘরে সিঁদ কাটিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছে। চুরির রাত্রে সামান্য খুটখাট শব্দে তাহার ঘুমের ব্যাঘাত একটু আধটু যে না হইয়াছিল তাহা নয়, তবে সে শব্দটা যে ঘরে চোর আসার দরুণ হইতেছিল, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই—কারণ একে পোক্ত ইমারৎ, তাহার উপর দুয়ারে শক্ত খিল আঁটা ছিল। সকল ব্যাপার সকালের অলোয় ফাঁশ হইয়া পড়িল! কাজেই ক্ষিতীশচন্দ্র আর আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিলেন না, নিজে হইতেই ধরা দিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন। এণাক্ষিকে তাঁহার চাই, তাঁহার পরম স্নেহের মাতৃহীন শিশুসন্তান দুইটিরও এণাক্ষিকে চাই, তাঁহার পরমপূজ্যা জননীরও তাহাকে চাই! এণাক্ষির স্থান এই পরিবারেই, ইহার বাহিরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও নাই।

এণাক্ষি তাহার অন্তরের মাধুর্য্যে ও বাহিরের রূপে ক্ষিতীশের মনে প্রাণে দাবানল জ্বালিয়া দিয়াছে। ক্ষিতীশ এ আগুন-লাগা পূর্ব্বেই টের পাইয়াছেন কিন্তু নিভাইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। আজ এই এত নিকটে তাহাকে পাইয়া তাঁহার সর্ব্বশরীরে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল।

এণাক্ষির ব্যবহারে ক্ষিতীশের ধারণা পূর্ব্বাবধিই জন্মিয়াছিল যে সে তাহাকে ভালবাসে ; কিন্তু দুয়ের মধ্যে সুযোগাভাবে মুখোমুখি কোন কথাবার্ত্তাদি না হওয়ায়, ক্ষিতীশ আত্মনিবেদন করিতে এতদিন সাহসী হইতে পারেন নাই। ক্ষিতীশের মনে হইল আজ মাতার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে এণাক্ষি একাধিকবার ইঙ্গিতে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে যাহা ক্ষিতীশকে এমন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ক্ষিতীশ ভাবিল, তাহার অন্যায়। কেন এতদিন সে সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া, তাহার প্রেম নিবেদন করে নাই? পুরুষই তো চিরদিন প্রেমভিক্ষা করে, রমণীর ও-কার্য্য স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই ভাবিলেন প্রিয়তমা অভিমান ভরে চলিয়া যাইতেছে।

ক্ষিতীশের মাথার মধ্যে প্রলয়-বহ্নি জ্বলিতে লাগিল; ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দে হৃৎস্পন্দনে তাঁহার সমস্ত রক্ত নৃত্য করিতেছিল; চক্ষের সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব লুপ্ত হইয়া যাইতে লাগিল। তাই এণাক্ষিকে ফিরাইয়া তিনি যে কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল নীরবে তাহার মুখপানে বিহ্বলভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এণাক্ষি কহিল—"এখন তবে যাই অন্য সময় শুনব'খন—মার ভাত বোধ হয় হ'ল, তাঁর খাবার জায়গা টায়গা গুলো করি গে—"

ক্ষিতীশের চমক ভাঙ্গিল, তিনি কহিলেন—"না, না, দাঁড়াও। এণা—এণা"

"বলুন্—"

"তোমার বদ্‌নাম, চাকরী ছাড়া, অপমান—সব আমারি জন্যে—আমায় ক্ষমা কর্‌বে—"

"ছি ছি, ওসব কি বল্‌চেন? আপনি বরং আমার রক্ষাকর্ত্তা অন্নদাতা, আমার সব চেয়ে বড় উপকারী—ও-কথা বল্‌বেন্ না—আপনি লোক চক্ষে আমার পর হ'লেও অতি-আপনার, গুরুজন—"

"তবে, আমাদের ছেড়ে যেতে চাও কেন?"

"অন্য সময়ে বল্‌ব। আপনি এখন উত্তেজিত—"

ক্ষিতীশ খপ্ করিয়া এণাক্ষির হাতটি ধরিয়া ফেলিয়া মিনতি জানাইয়া কহিলেন, "না, অন্য সময় আর নেই, হবেও না, এখনি শুন্‌তে চাই, বল—"

এণাক্ষি হাত ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিল—"ছিঃ, হাত ছেড়ে দিন, কেউ দেখতে পাবে। বলবে কি লোকে? আপনাকে তো এমন বিচলিত হতে কখনও দেখি নি?"

হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্ষিতীশ কহিলেন—"কখনও হই নি, এখন হয়েচি! তুমিই করেচ—যাক্, তোমায় আমি ছাড়ব না। তুমি এ গৃহের দেবী হয়ে চিরবিরাজ কর, আমার মাতৃহীন শিশু দু'টির মা হও! আমার শূন্য ঘর পূর্ণ কর; বল, বল, তা হলে মাকে আমি এখুনি সব বলি—নীরব থেকো না এণা! মা ভারী খুসী হবেন তা হলে—"

"কি যে বলেন আপনি, তার ঠিক নেই। আমি যে আপনার ছোট বোন্, অন্যের বাগ্‌দত্তা। নিশ্চয় আপনার মাথার ব্যামো হয়েচে। একটু চুপ করে শুয়ে ঘুমুন দেখি!" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে এণাক্ষি দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার সর্ব্ব শরীর এমন কাঁপিতেছিল যে, তাহার কেবলি ভয় হইতে লাগিল বুঝি বা পড়িয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে ক্ষিতীশ কলিকাতা আসিয়া শিয়ালদহ পুলিশকোর্টে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এণাক্ষি আর কোনও অমত করিল না, ক্ষিতীশের সঙ্গেই চলিয়া আসিয়া, যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল।

কলিকাতা আসার ১০।১৫ দিন পর হইতেই এণাক্ষি গিন্নিকে ধরিয়া বসিল, দাদাকে বলিয়া তাহাকে কোনও ইস্কুলে একটা চাকরী করিয়া দিতে হইবে। মা যতই বুঝান, এণাক্ষি ততই পীড়াপীড়ি করে।

চতুর বৃদ্ধা এণাক্ষির মধ্যে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। সে যেন সর্ব্বাদাই একটু সন্ত্রস্ত, সজাগ এবং পারতপক্ষে ক্ষিতীশের সম্মুখে বড় বাহির হইতে চাহিত না, কেমন এড়াইয়া চলিত। অথচ, ক্ষিতীশের চক্ষু কাহাকে খুঁজিয়া ফিরিত, কাহার কথা শুনিবার জন্য তাহার কাণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিত, কেমন যেন একটা বিমনা ভাব। এণাক্ষিকে দেখিতে পাইলেই তাঁহার মুখমণ্ডল এক অভিনব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

এতদিন এণাক্ষির সহিত বাস করিয়া ক্ষিতীশের জননী এণাক্ষিকে খুব ভালই চিনিয়াছেন ; তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গত জন্মের কন্যা পর্য্যন্ত বলিয়া তাহাকে নিজ কন্যানির্ব্বিশেষে সস্নেহে পালন করিতেছেন। স্বজাতিও বটে ! তবে একবার গায় হলুদ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, মনটা ঠিক প্রসন্ন হইতেছে না। তবে ছেলে চিরকাল বিপত্নীক থাকার চেয়ে এ

মেয়েকে যদি স্বেচ্ছায় বিবাহ করে তবে তিনি ঐ খুঁৎটুকু আর ধরিবেন না। বরং ওটুকুর জন্য একবার গ্রহশান্তি কালীপূজা, স্বস্ত্যয়ণ প্রভৃতি করাইলেই ও-দোষটুকু কাটিয়া যাইতে পারে। এখন পুত্র বিবাহ করিতে রাজী হইলে হয়! পুত্রের বোধ হয় মন আছে, পুত্রের কল্যাণ এবং এই এণাক্ষি যাহাকে এত ভালবাসেন, তাহাকে পুত্রবধূরূপে পাইবেন, এই চিন্তায় তাঁহার পুত্রস্নেহাতুর মাতৃহৃদয়খানি অপরূপ বাৎসল্যরসমাধুর্য্যে পুলকে ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

ক্ষিতীশ সন্ধ্যায় বাহিরের ঘরে বসিতেই জননী সোজাসুজি প্রস্তাব করিলেন; ক্ষিতীশ হাতে স্বর্গ পাইলেন, কারণ এই কথাটিই তিনি কত দিন ধরিয়া বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিলেন না। বহু দিনের গুরুভারাতুর বুক এক নিমেষে পালকের মত লঘু হইয়া গেল; ক্ষিতীশ আনন্দে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন একটা পরীর রাজ্যে প্রবেশ করিল। মাতার আনন্দের সীমা রহিল না।

কিন্তু গোল বাধাইল এণাক্ষি। সে ক্ষিতীশকে কেন কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজী নয়। জননী আকাশ হইতে পড়িলেন! তাঁহার ধারণা ছিল ক্ষিতীশই অমত করিবে আর এই কুড়ানী মেয়েটা এমন ইন্দ্রের মত স্বামী লাভ হইবে শুনিয়া আশাতীত সৌভাগ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু এ কি বিপরীত ঘটিল? হঠাৎ এণাক্ষির উপর তাঁহার সমস্ত আক্রোশ ক্রোধ এবং ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হইল। কেবলি তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এই দণ্ডে ওর মুখটা যদি নোড়া দিয়া থেঁৎলাইয়া দিতে পারিতেন। এণাক্ষি শুধু সবিনয়ে জানাইল যে, এরূপ পতি-লাভ জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে

মহাপাতকী, তাহার সে পুণ্যের এক শতাংশও নাই। তাহার অদৃষ্টে সত্যই অনেক কষ্ট আছে, নহিলে এমন সৌভাগ্য কেহ প্রত্যাখ্যান করে?

জননী ছাড়িবার পাত্র নহেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কারণটা কি শুনি?"

এণাক্ষি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সলজ্জভাবে উত্তর দিল—"আমি বাগ্‌দত্তা।" জীবনে সেই বিবাহের অভিনয়ে, সে যাহার জন্য উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, যদি কখনও তাহাকে ফিরিয়া পায় তবে সে তাহারই ঘর করিবে, একমাত্র তাহারি, অন্য কাহারও নয়, কারণ সেই না-জানা লোকটিই তাহার আসল স্বামী। এণাক্ষি তাহাকে জানে না, চেনে না, কখনও দেখেও নাই, কিন্তু পতিরূপে যখন একবার সেই পুরুষকে মনন করিয়াছে, তখন তিনি ইন্দ্র চন্দ্র যিনিই হউন অন্য কোনও পুরুষকে সে আর স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে অপারগ। তাহা করিলে সে দেহে নয়, মনে মনে দ্বিচারিণী হইবে। তাহার বিশ্বাস, সে দেহে ও মনে সতী, সতীর এ মনোবাঞ্ছা সতীর পতি নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন! সে তাহার পতিকে আবার ফিরিয়া পাইবে; তাঁহারি আসার প্রতীক্ষায় সে ব্রহ্মচারিণী হইয়া নিত্য শিবপূজা করিতেছে এবং যাবজ্জীবন করিবেও।

উত্তর পাইয়া, গিন্নীর সমস্ত রাগ গলিয়া জল হইয়া গেল। তিনি সশ্রদ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, এণাক্ষি সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সামান্য কুড়ানী মেয়েটার সতীত্বের অসামান্য জ্ঞান দেখিয়া জননী নির্ব্বাক হইয়া সেইখানে বসিয়া রহিলেন।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। ক্ষিতীশের বৈঠকখানায় ক্ষিতীশ ও শ্যামসুন্দর বাবুর কথা হইতেছিল। শ্যামসুন্দর বাবু শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টের উকিল।

শ্যাম। আপনার নামে একজন স্ত্রীলোকঘটিত একটা বিশ্রী মকদ্দমা রুজু করাবার জন্যে আমার কাছে আজ বিকেলে এক মক্কেল এসেছিল; কিন্তু ব্যাপারটায় আমার কেমন একটা খট্‌কা লাগায় আমি আপনার কাছে এলুম, ব্যাপারটা কি তাই জান্‌বার জন্যে—

ক্ষিতীশ। স্ত্রীলোক-ঘটিত মকদ্দমা? আমার নামে?

শ্যাম। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ব্যাপারটাতে একটা সাজোস আছে বলে মনে হচ্ছে। আপনার মত একজন ভদ্রলোক, পদস্থ কর্ম্মচারী হঠাৎ অপদস্থ হবেন, তাই—

ক্ষিতীশ। বেশ, বেশ, এ অতি সাধু প্রস্তাব। আমায় কি করতে হবে বলুন!

শ্যাম। দেখুন, মিষ্টার বরাট, এ ব্যাপারটায় আমার নিজেরও একটু কৌতূহল আছে—

ক্ষিতীশ। বেশ তো, বেশ তো, বলুন না।

শ্যাম। তার নাম বল্‌লে দেবীপদ মল্লিক, বয়স প্রায় ৫০, দেখতে ঠিক কোকেন-খোর গুণ্ডার মত। লোকটা এসে বল্‌লে যে, তার

মেয়ে কুমারী এণাক্ষি মল্লিক ঝিনুকগাছি মেয়ে-ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রী হয়ে গেছল, আপনি তাকে কাজ ছাড়িয়ে ফুসলে অসদভিপ্রায়ে এখানে নিয়ে এসেচেন। ঝিনুকগাছির জমিদার ত্বিষাম্পতি কুণ্ডু না কি একজন সাক্ষীকেও সঙ্গে করে এনেছিল।

বলিয়া শ্যামসুন্দরবাবু খুব এক চোট হাসিলেন।

ক্ষিতীশের মুখ শুকাইয়া গেল। কহিলেন,—"এণাক্ষি মল্লিক ওখানে কাজ করতে গিয়েছিলেন, কাজ করছিলেনও, কিন্তু সেখানকার লোকদের জ্বালায়, বিশেষ করে ঐ ত্বিষাম্পতি কুণ্ডুর অত্যাচারেই তিনি কাজ ছেড়ে চলে আস্‌তে বাধ্য হয়েচেন। তিনি আমার বাড়ীতেই আছেন। হ্যাঁ, তাঁর বাপ মকদ্দমা দায়ের করতে এসেছিলেন বল্লেন না? কিন্তু আমি তো শুনেচি, তাঁর ত্রিকূলে কেউ নেই। আর সেই জন্যেই মা তাঁকে সঙ্গে করে এনেচেন।"

শ্যামবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন—"ঠিক। আচ্ছা তাঁর বাপের নাম কি জানেন?"

"না, তা তো জানি না।"

"বাড়ী?"

"বীরভূম জেলায় কোথায়।"

"ঠিক।" শ্যামবাবু আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চুপ করলেন যে, শ্যামবাবু?"

শ্যাম। আচ্ছা, তিনি কি বলেচেন যে তিনি কুমারী?

ক্ষিতীশ। না, তাও বলেন নি ঠিক। তবে লেখেন, কুমারী; বিয়ের রাত্রে কি একটা গোলযোগ বেধে, মেয়ে আর সম্প্রদান হয় নি।

শ্যামবাবুর নিঃশ্বাস খুব জোরে জোরে পড়িতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি এখনও বিবাহ করেন নি?"

ক্ষিতীশ। বিবাহ তো করেনই নি, করবেনও না! তিনি তাঁর সেই অজানা স্বামীর ভরসাতেই, ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যাচ্ছেন। বিয়ের সম্বন্ধ এক আধটা এসেছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেচেন!

"বলেন কি!" শ্যামবাবুর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকমের উত্তেজিত।

ক্ষিতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যে এত উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন? এসব ব্যাপার কিছু জানেন নাকি?"

শ্যাম। কিছু কিছু জানি বলেই তো বোধ হচ্ছে। দেখুন ক্ষিতীশবাবু, আমার বিয়েতেও ঠিক অমনি একটা কেলেঙ্কারী ঘটেছিল, সে মেয়ের নামও এণাক্ষি ছিল। তার বাপের নাম কিন্তু দীনদয়াল মল্লিক। বাড়ীও বীরভূম জেলায়, জলডুবি গাঁয়ে। আমি সেই মেয়েকেই খুঁজচি, আমিও আজ পর্য্যন্ত অবিবাহিত। কারণ, সে মেয়ে যদি বিয়ে করে থাকে, তা হলে আমিও একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হতে চেষ্টা করি। আর যদি সে বিয়ে না করে থাকে, পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তা হলে আমি এখনও তাকে গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত। আমারও পণ, যতদিন তার সন্ধান না পাই, ততদিন আমিও তাঁর আশায় থাকব। এই জন্যে এণাক্ষি নাম শুনলেই আমি একটু কৌতূহলী হয়ে পড়ি, আর খোঁজ খবর করি, সে-ই কিনা। এমন আরও ৫।৭টা করেচি ইতিপূর্ব্বে।

ক্ষিতীশ বলিলেন—"বেশ, বেশ, এর সঙ্গেও আপনি তা' হলে একবার কথাবার্ত্তা কয়ে দেখুন, আসুন ভেতরে।"

* * * *

দুই দিন পরেই অর্থাৎ ৩রা ফাল্গুন, শুভ-বিবাহের প্রশস্ত দিন। সেই দিনে এণাক্ষির আবার গায়ে হলুদ হইয়া শ্যামসুন্দরের সঙ্গে বিবাহ হইল; ক্ষিতীশের মা কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র নূতন ভগিনীর বিবাহে যৌতুকস্বরূপ অনেক গহনা আনিলেন, কিন্তু এণাক্ষি ক্ষিতীশের শিশু দুইটি ছাড়া আর কিছুই লইল না। এই দুইটি লইয়াই বধূ প্রথম স্বামীর ঘর করিতে চলিল।

নিষ্কৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশে সেবার বিষম অজন্মা, কারণ জল-দেবতার অনুগ্রহ সে বৎসর একেবারেই হয় নাই বলিলেই হয়। 'বিধাতার মার, দুনিয়ার বা'র',— কাযেই দুনিয়ার মনুষ্য-জাতীয় জীব, যাহারা এক ঘা' মার খাইলে দশ ঘা' দিবার জন্য প্রাণপণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে তাহারাও—অম্লানবদনে ঠিক নয়,—সেই অদৃশ্য মার বাধ্য হইয়া সহ্য করিল। প্রথমে আশা করিল; আশা ফুরাইতেই প্রার্থনা, স্তব, কাকুতি; মিনতি, অনুযোগ, অভিযোগ, বাটিপোতা, প্রভৃতি নানারূপ ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিল; তাহাও যখন উক্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিধাতা-পুরুষ শুনিলেন না, তখন বলহীন নিরুপায়ের ব্রহ্মাস্ত্র নানাবিধ অশাস্ত্রীয় এবং অহিন্দুর ভাষায় তাঁহাকে দিনরাত্রি বিশেষিত করিতে লাগিল। কিন্তু সে-ব্যক্তি এমনই পাষাণ এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানহীন যে, তবুও তিনি কোন উচ্য-বাচ্য পর্য্যন্ত করিলেন না। অন্যান্য লোকে ক্ষেতের ভরসা পরিত্যাগ করিল। ধানগাছগুলি এক হাত পরিমাণ বৃদ্ধিলাভ করিয়া, যকৃৎ-দুষ্ট রোগীর মত পীতবর্ণ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তার পর ধর্ম্মঘট করিয়া সত্যাগ্রহীর মত একদিন গাছগুলি শুইয়া পড়িল, আর উঠিল না।

মানুষের অন্ন যেমন ফলিল না, গরু-বাছুরের খাদ্যও সেইরূপ হইল না।

মাঠ ঊষর, প্রান্তর বিস্তীর্ণ, রক্ত-পীত-ধূসর-বর্ণ; কোথাও হরিতের লেশ পর্য্যন্ত নাই। যত-দূর দৃষ্টি চলে, তত-দূর পর্য্যন্ত ধূ-ধূ মরুর মত।

ভাদ্র মাসের প্রারম্ভেই দেবতার দয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল—নানা আকারে;—যথা, কলেরা বসন্ত, জ্বর প্রভৃতি। ডাক্তার বাবুরা রোগী পান, কিন্তু পয়সা নাই। তাঁহারা পেটেণ্ট ঔষধ-সৃষ্টিতে লাগিয়া গেলেন। উকিল মহাশয়েরা গালে হাত দিয়া বাসায় কেবল তামাক খান, এবং আদালতে গিয়া বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া দেশের দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করেন; কেহ-কেহ এই সময়ে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিতে মনঃসন্নিবেশ করিলেন; যেহেতু ওকালতী ব্যর্থ হইলেও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বৃথা যাইবে না। সকলেই এইরূপে অর্থোপার্জ্জনে যখন চিরাচরিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, নব-নব সদুপায় অবলম্বন করিলেন, শ্রীমান্ দাশরথি দাস ওরফে দেশো মালোও তখন একটা সুরাহা দেখিতে পাইল।

এই সময়, অর্থাৎ এমন দুর্দ্দিনে, যখন ডাক্তার উকিল পর্য্যন্ত বিশেষ চিন্তিত,—এক সম্প্রদায়ের কিন্তু এ-একটা ভারি মরশুম্। সে-সম্প্রদায় চা-বাগিচার জন্য কুলি-সংগ্রাহক আড়কাঠি-কুল। সমস্ত নামটা তাহার কেহই জানিত না,—শুধু পাঁড়েজী নামক একজন আড়কাঠি একদা মাঝডাঙ্গা গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং বিন্দি তেলিনীর বহির্কক্ষে, যেখানে শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডারা, ব্রজবাসীরা, কাশীর শিবদূতগণ, গয়ার স্বনামখ্যাত অসুরবরের অনুচরবৃন্দ আড্ডা করিয়া থাকেন, সেইখানে নিবাস আরম্ভ করিলেন। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, মাঝডাঙ্গার বিন্দি তেলিনীর কক্ষটিই এ গ্রামে উক্ত প্রকার ভ্রমণকারীদের ডাকবাংলা অথবা

গ্রাণ্ডহোটেল রূপে বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাযেই, সেখানে কোন নূতন লোককে অবস্থান করিতে দেখিলেই, লোকের মনে তৎক্ষণাৎ কৌতূহল হইত লোকটিকে জানিবার জন্য। কারণও তাহার ছিল নিতান্ত মন্দ নয়,—বস্তু-তান্ত্রিক। পাণ্ডা আসিলেই লোকের চুয়া ও কর্পূরের মালা, ব্রজবাসীদের দান নামাবলী, শিব-দূতগণের দ্বারা কাশীর পেয়ারা, কাঠের খেল্‌না এবং গয়ালীদের নিকট হইতে প্যাড়া-নামক অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন প্রাপ্তি ঘটিত। এতদ্দ্বারা তৎপুরুষের আগমনবার্ত্তা গ্রামময় যেরূপ শীঘ্র এবং প্রীতির সহিত বিঘোষিত হইত, তেমন বোধ হয় 'অমৃতবাজার' বা 'ষ্টেট্‌সম্যানে' পূর্ণপৃষ্ঠা সচিত্র বিজ্ঞাপন অথবা ব্যাণ্ড বাজাইয়া নির্ব্বিচারে অজস্র হ্যাণ্ডবিল বিলি করাইলেও হইত কি না সন্দেহ।

দাশু দেখিল, খোট্টা,—সুতরাং নিশ্চয়ই সে এক জন পাণ্ডা। সে গেল। কয়েক ছিলিম তামাক খাইল; দুই ছিলিম 'বড়-তামাক'ও পাঁড়েজীর প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিল—মনটা একটু প্রফুল্ল এবং সচেতন।

দাশুর সংসারে তাহার জননী, একটী কন্যা এবং পত্নী। সে ছাড়া আর সকলেই জ্বরে শয্যাগত। দাশুর বয়স ত্রিশ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহ। তাহার চারি বিঘা রাজ-প্রদত্ত ক্ষেত আছে; তাহার জন্য জমিদারের যখনি মাছের প্রয়োজন হয়, দাশু গিয়া জাল ফেলে এবং মৎস্য সরবরাহ করে। বাদ-বাকী দিন সে চাষ করে, মাছ ধরে,—মা ও স্ত্রী বাজারে বিক্রয় করে। কন্যা দত্তদের বাড়ী গোয়াল সাফ করে এবং গোবর দেয়,—তৎপরিবর্ত্তে দুইবেলা খাইতে পায় এবং মাসিক চারি আনা বেতন পায়। মেয়ের নাম মুক্তো, অর্থাৎ মুক্তকেশী। বয়স আট বৎসর

দাশু বাড়ী আসিয়াই, ঘরে ঢুকিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, কেমন আছিস্ আজ আর জ্বর এয়েচে? আর ওরাই বা কেমন?"

মা পুত্রের হঠাৎ ঈদৃশ মাতৃ-ভক্তিতে মনে মনে প্রীত হইয়া, পুত্রের আরও একটু ভক্তি ভোগ করিবার জন্ত আনুনাসিক স্বরে কহিল,—"আজ আর আমাদের কেরুরই জ্বর আসে নেই, বাবা। এখন কবে সেরে উঠবো, তাই ভাবচি।"

"হাঁ, শীগ্গির শীগ্গির সেরেই ওঠ। পেট চলা চাই ত?" তাড়াতাড়ি কথা কয়টি বলিয়াই—সম্প্রতি-শ্রুত মতি-রায়ের যাত্রার "দাদা অভি, যদি যাবি" গান্‌টি গুন্-গুন্ করিয়া নাকি-স্বরে গাহিতে-গাহিতে বড়ঘরের দাওয়ার কোণে বসিয়া হর্‌ক্ষিটি টানিয়া তামাক খাইবার জন্ত চক্‌মকি ঠুকিতে লাগিল।

পাঁড়েজীর নিকটে দুই-তিন দিন ঘন-ঘন গতিবিধি করিতে-করিতে, একদিন দাশু কুড়িটি টাকা আনিয়া জননীর হস্তে দিয়া বলিল যে, সে কলিকাতায় চাকুরী করিতে চলিল। পাঁড়েজীর জনৈক অত্যন্ত নিকট আত্মীয়,—কারণ, সম্বন্ধটা যে কি, তাহা সে সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই,—কলিকাতায় থাকেন; তিনি এখন এই কুড়ি টাকা পাঠাইয়াছেন, তার পর সেখানে গেলে আরও দিবেন। কাজও এমন-কিছু শক্ত নয়,—বাগানের মালীগিরি।

দাশু কথা কয়টি এমন সহজ ভাবে এবং পুলকিত ও উৎসাহিত হইয়া বলিল যে, তাহাতে কাহারও কোন দুঃখ হইল না; বিশেষতঃ, যখন বৃক্ষে আরোহণ না করিতেই এক কাঁদি সুপরিপক্ক কদলী লাভ হইল, তখন, এ যে একটি অপরিহার্য্য দাঁও, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

সারারাত্রি স্ত্রী, জননী ও নিজে পরামর্শ আঁটিল,—সংসারের কার্য্য কে কি করিবে, এবং ভদ্রাসনখানির কি প্রকার পরিবর্ত্তন ভবিষ্যতে আবশ্যক হইবে; কন্যার বিবাহ দেশে অপেক্ষা কলিকাতাতেই হওয়া শ্রেয়ঃ—প্রভৃতি। আবার অজ্ঞাত কারুণিক কলিকাতাবাসী সেই বাবুর বাগান যখন আছে, তখন তাঁহার পুষ্করিণী যে গোটা-দশেক নিশ্চয়ই আছে, সে বিষয়ে আর ভুল কি? কেবল তৎবাসী মৎস্যগুলির ঠিকা লওয়াটিই আপাততঃ কেবল বাকী রহিল। শেষোক্ত সৌভাগ্য যদি কখনও ঘটে, তবে সকলকেই যে কলিকাতা যাইতে হইবে, ইহাও এক প্রকার স্থির হইয়া রহিল; যদিও ইহাতে বুড়ী কেবল একটু নিম্‌রাজি হইল মাত্র।

পরদিন দাশু লাল ডুরে একখানি গামছা কিনিল। মাতার, স্ত্রীর এবং কন্যার একজোড়া করিয়া শাড়ী কিনিয়া দিল, কারণ পূজা সন্নিকট। নিজের কাপড় আর কিনিল না,—কারণ, বাবুর বাড়ী পূজায় তার তো মিলিবেই—কারণ বাবু যখন এত-বড় লোক।

বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই ইচ্ছা যে, পূজার পর দাশু যায়। দাশুরও তাহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পাঁড়েজী বলিয়াছেন যে, বিলম্বে কার্য্যহানি সুনিশ্চিত, অতএব, এ দুর্দ্দিনে এমন সুযোগ ছাড়া নিছক বাতুলতা ব্যতীত আর কি?

গায়ে বকশিষপ্রাপ্ত ছেঁড়া এক ডবল-ব্রেষ্ট সার্ট, পরণে আটহাত একখানা কাপড় ও কোমরে নূতন লাল গামছা বাঁধিয়া, দুঃস্থ পরিবারের দুঃখমোচন করিতে দাশু পাঁড়েজীর সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইল।

দাশরথির অকস্মাৎ অর্থলাভ, চাক্‌রিলাভ এবং কলিকাতা-গমন-

ব্যাপার এতদিন গ্রামের লোকের কাছে গোপন ছিল ; যেহেতু পাঁড়েজী নিষেধ করিয়াছিল। পরশ্রীকাতর মন্দলোকের ত অভাব নাই ? হয়তো তাহারা দাশরথিকে বাধা দিবে। তাহার একান্ত হিতৈষী পাঁড়েজী নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া তাহার যে সৌভাগ্যের সূচনা করিয়া দিল, গ্রামের পাঁচজনে শুনিলে হয়তো তাহা হইতে দিত না। কিম্বা আরও দশ জনে উপর-পড়া, রবাহুত হইয়া জুটিয়া সমস্ত পণ্ড করিয়া দিত। দাশুর মা পাঁড়েজীর কল্যাণের জন্য নিয়ত কামনা করিতে লাগিল। তাহার বড় দুঃখ রহিয়া গেল, একটা ভাল মাছ একদিন এমন মহানুভব মহাপুরুষকে দেওয়ার ভাগ্য তাহার হইল না !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ চারি বৎসর হইয়া গেল, দাশু জলপাইগুড়ি জেলায় একটা চা-বাগানের কুলি। বর্দ্ধমান জেলার পল্লীগ্রামের চাষারা নির্ব্বুদ্ধিতায় নিখিল-ভারতবর্ষীয় পল্লীবাসীদের মধ্যে অদ্বিতীয়; তাই প্রথমে দাশু কিছুই বুঝিতে পারে নাই। এবং পাঁড়েজীর মত সদ্‌ব্রাহ্মণ,—যিনি বঙ্গদেশীয় নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণেরও অন্ন গ্রহণ করেন না পাছে জাতি নষ্ট হয়, তিনি যে, এরূপ প্রবঞ্চনা করিবেন, অথবা অসত্য কথা বলিবেন, ইহা মালো-নন্দনের মস্তকে প্রথমে ঢুকিতেই চাহে নাই। কিন্তু বাগানে অষ্টাহকাল বাস করিতেই, সহস্রাধিক সমদশাপন্ন সহযোগীদিগের কথায় জানিতে পারিল যে, পাঁড়েজী ও তাঁহার অসম্বন্ধীয় আত্মীয়গণ এইরূপ জাল ফেলিয়া নিয়তই মনুষ্য ধরিয়া বেড়ান। সকলেই আপন আপন বুদ্ধিহীনতায় এবং দুর্ভাগ্যে শিরে করাঘাত করে, কাঁদে এবং কাজ করে।

কষ্টটা যে কি তাহা বুঝিতে, অন্যান্য সকলের মত দাশরথিরও কিছুদিন বিলম্ব হইল। যখন অবস্থার সম্যক উপলব্ধি ঘটিল, তখন সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল; এবং পাঁড়েজীর উপর তাহার প্রীতিটা যত মধুময় ছিল, তত বিষ-তিক্ত হইয়া উঠিল। সময়ে সময়ে তাহার মনে হইত যে, যে তাহাকে তাহার নিভৃত পল্লীকুটীর হইতে, স্নেহ-পরিপূর্ণ সুখনীড় হইতে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া, তাহার আজন্ম-পরিচিত সুখ-সান্ত্বনার স্নিগ্ধ আবেষ্টন হইতে ছিনাইয়া, তাহার শতসহস্র দুঃখ-দারিদ্র্যের সমুদ্রমন্থন

সঞ্জাত একান্ত বাঞ্ছিত প্রীতির এবং আদরের পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে নিকটে পাইলে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফাঁসি যায় কিম্বা দ্বীপান্তরিত হয়, সেও ভাল—তবু বাগানের কুলিগিরি তাহার অসহ্য। কিন্তু উপায় নাই। দাশরথি নিরুপায়, নিষ্ফল আক্রোশে আপনিই গর্জ্জিয়া উঠে; আবার পাঁচজনকে দেখিয়া, সর্দ্দারের রক্তচক্ষুতে ভীত হইয়া ভুলে। পলাইবারও উপায় নাই,—উপায় থাকিলে, আবার হাতে পয়সা হয় না।

দাশু উপার্জ্জন যাহা করে, গ্রহবৈগুণ্যে ব্যয় তদপেক্ষা প্রায়ই বেশী হইয়া যায়। কাজ করিতে-করিতে যদি কখনও সর্দ্দার তাহাকে একটু বসিয়া থাকিতে দেখে, অমনি তাহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়,—সেদিনের মজুরী কাটা গেল। কাজেই মা শীতলা অথবা ওলাইচণ্ডীর পূজার মত সর্দ্দার সাহেবকে মাসে-মাসে কিছু দিতেই হয়। যে বাবু মজুরী বাঁটেন, তাঁহারও প্রাপ্য বরাবরকার—তাহাও জমিদারের খাজনার মত অবশ্য দেয়; অর্থাৎ তিনি নিজ অংশ কাটিয়া দয়া করিয়া বাকীটা প্রদান করেন। বাগানে যে ব্যক্তি মুদীখানার দোকান করে, তাহাকে বাগানের বাবুদিগকে অল্পমূল্যে সামগ্রী সরবরাহ করিতে হয় বলিয়া, কুলিদিগকে তাহার খরচ পোষাইতে হয়। সেই জন্য বাজারে সাড়ে চারি টাকা মণ চাউল কিনিয়া বাগানে তাহাকে নয় টাকায় বিক্রয় করিতেই হয়;—কারণ তাহারও, কুলিগণ ব্যতীত, অন্য সকলেরই মত পুত্র-পরিবার তাহারই উপর নির্ভর করে। ইহা ছাড়া, ধারে বিক্রয়ে তাহার আরও সুবিধা আছে যে, জিনিস বিক্রয় না করিয়াও দেনা বাড়াইবার বিশেষ সুযোগ। ফলতঃ ইহারা কেহই কখনও ঋণমুক্ত নহে

—দাশুও হইতে পারে নাই; সুতরাং বাগানে আসিয়া প্রথম দুই মাস মাত্র দুইবার সে আট টাকা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়াছিল। তাহার পর আর কখনও এক পয়সাও পাঠাইতে পারে নাই,—তাহার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও সে অসমর্থ।

তাহার সেই বিশাল বক্ষ, বলিষ্ঠ দেহ আর নাই। এ দেশীয় জল-হাওয়ার একটী অতি মহৎ গুণ এই যে, কুইনীন্ ভিন্ন জল-হাওয়া হজম হয় না। এ কারণ দাশুর এখন দাঁড়াইয়াছে এই যে, জঠরে অন্নজলের অভাবটা প্লীহা-যকৃৎ পূরাইয়াছে, অবকাশ-কালটি ঔষধ সেবনে কাটে এবং অপরাহ্নগুলি জ্বরের ঘোরে যায়; বিনা আয়াসে এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে।

ক্রমে দাশুর স্বাস্থ্য একবারে গেল। যে আগে দেড় মণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিত, সেই দাশু এখন পাঁচ সের বোঝা উঠাইতেও হাঁপাইয়া পড়ে। মাসের অর্দ্ধেক দিন কামাই; যাহা উপার্জ্জন করে—তাহারও কিছু অংশ সর্দ্দার এবং বাবুকে দিয়া, বাকীটা দোকানের বাকীতে উশুল দেয়,—তবুও একবারে সব ঋণ শোধ হয় না।

দাশু দেখিল, সে রোজগারের আশায় এখানে প্রবঞ্চিত হইয়া আসিয়া উপার্জ্জন করিল, ম্যালেরিয়া, প্লীহা এবং অপরিশোধ্য ঋণ। কতবার সে ভাবিয়াছে, সাহেবকে গিয়া জানাইবে যে, সে দেশে ফিরিয়া যাইবে; কিন্তু সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ আর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু চা-বাগানের বড়সাহেবের দেখা পাওয়া অসম্ভব। যার সম্ভব, তার শুধু জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলেই হয়। কাযেই নিরুপায় দাশু বাগানেই থাকে। কায করুক্ আর নাই করুক্,

ছুটি নাই, মুক্তি নাই! যদি এমনি ছুটি না পায়—তবে মরিয়া ছুটি করিয়া লইবে ভাবিয়া, দাশু কতবার আত্মহত্যা করিতেও সঙ্কল্প করিয়াছে; কিন্তু পারে নাই;—যদি কখনও সে মুক্তি পায় তো দেশে গিয়া পুনরায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সহিত মিলিত হইতে পারিবে, এই ভরসায় পারে নাই। সময়ে-সময়ে তাহার মনে হইয়াছে যে, একবারে সমস্ত লোককে সে এক রাত্রে খুন করিয়া আপনার এবং তাহার মত সমদশাগ্রস্ত সহস্র-সহস্র নর-নারীর বন্ধন মোচন করিয়া দেয়;—কিন্তু পরক্ষণেই আপনার বাতুলতায় সে আপনিই হাসিয়াছে। তাহার মন দিবারাত্রি তাহার পরিবারবর্গের চিন্তাতেই পরিপূর্ণ। এতদিনে তাহারা কে কত বড় হইয়াছে, কাহার দেহে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সাংসারিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, কন্যার বিবাহ হইল কি না, তাহার ক্ষেতে কে চাষ দিতেছে, পাশের ক্ষেতে কি হইয়াছে,—এই কথাগুলিই ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে মধুচক্র-নির্ম্মাণ-রত মৌমাছির মত রাত্রিদিন আনাগোনা করিতেছে। গ্রামের লোকেরা তাহার কথা বলে কি না, বন্ধুরা কি বলে, শত্রুরা কি ভাবে, আত্মীয়েরা কি মনে করে,—সে আপন মনেই কথা গাঁথিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর তৈরি করে। কখনও মনে করে, যদি সে আর দেশে না ফিরে, তবে তাহার পরিবারের কি দশা হইবে—সে চিত্রও আঁকে। আবার কখনও ভাবে, জ্বর সারিয়া গেলে শরীরটা এবার সুস্থ হইলে, সে দ্বিগুণ পয়সা উপার্জ্জন করিয়া নিশ্চয়ই দেশে ফিরিবে; কটিদেশে গেঁজেভরা রজতমুদ্রা দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলে অবাক্ হইয়া যাইবে। সেই কাঙাল পরিজনবর্গের ম্লান মুখে আনন্দোচ্ছল হাসির স্বপ্নে দাশরথি আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইত। কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহার

সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু সেটা কল্পনা! বাস্তব নিদারুণ কঠিন, কঠোর এবং নিষ্ঠুর। দাশু উন্মাদের মত রুদ্ধমুষ্টিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পরক্ষণেই আবার স্থির হইয়া বসিয়া পড়িত; আর তাহার চক্ষু হইতে দরদর ধারে তপ্ত জলধারা শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডযুগল বহিয়া টপটপ করিয়া গড়াইয়া পড়িত।

ন্যায্য-অন্যায্য নানা প্রক্রিয়া করিয়াও দাশু তাহার ছাড়পত্র যোগাড় করিতে যখন পারিল না, তখন ঠিক করিল যে একদিন রাত্রিকালে সে পলাইবে। প্রথম-প্রথম ভাবিত, ইচ্ছা করিলেই ত' সে যাইতে পারে, কিন্তু যখন আসিয়াছে এতদূর, তখন কিছু না কামাইয়া রিক্তহস্তে সে ফিরে কেমন করিয়া? তাই সকলের সঙ্গে হাসিমুখেই কায করিত। জ্বর আসিত, কম্বল মুড়ি দিয়া শুইত; এবং যাহা পাইত, তাহাতে তাহার সব কষ্টের অবসান হইত। কিন্তু পরে যখন দেখিল যে স্বাস্থ্য গিয়াছে, এখান হইতে নিষ্কৃতি নাই, এবং যাহা পায় তাহা এইখানেই উড়িয়া যায়,—তখন সে বাড়ী যাইবার জন্য পাগল হইল। স্বর্ণ-মৃগের অনুধাবন করিয়া সে এমন জালে পড়িয়া গিয়াছে যে, এখন সে নিজেই বাহির হইতে অক্ষম! অমনি তাহার সমস্ত রক্ত চম্ করিয়া মাথায় উঠে এবং অনুপস্থিত পাঁড়েজীর উদ্দেশে নিষ্ফল আক্রোশে যষ্টি উত্তোলন করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাঘ মাস। কন্‌কনে শীত। আকাশভরা মেঘ—অন্ধকার রাত্রি। কোলের মানুষ দেখা যায় না। দাশু আপনার কম্বল, কম্বলের একটী কোট, একটী ঘটী, একখানি পিতলের থালা, বাটি এবং গ্লাস, একটী পুঁটুলিতে খান ২।৩ ছেঁড়া কাপড়, একশিশি কুইনীনের বড়ি, কতকগুলি চা, সেরখানেক চাউল, চারিটি আলু, খানিকটা লবণ, একটা মাটির চোঙায় একটু সরিষার তেল এবং এমনি আরও কয়েকটা কি লইয়া উন্মাদের মত বাগিচা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বিগত কয়েকদিন যাবত সে কেবলমাত্র পলাইবারই ফিকির করিতেছিল; কিন্তু নানা কারণে সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই; তন্মধ্যে প্রধান, জ্বর বিশ্রাম না হওয়ার দরুণ দৌর্ব্বল্য ও দ্বিতীয়তঃ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহার প্রাপ্যটা আদায়। প্রধানতঃ এই দুই কারণেই সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই।

দোকানী একবার তাগাদা করিয়াছিল; কিন্তু দাশু আগামী কল্য দিব বলিয়াই রেহাই লইয়াছে। দাশু ঠিক করিয়াছে যে, সে অনেক দিয়াছে, আর দিবে না। যেন সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছে যে, তাহাকে ধনে-প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। বাগানের লোকেরা খাটাইয়া-খাটাইয়া, আধ-পেটা খোরাক দিয়া, তাহার ভীমের মত দেহ ছারেখারে দিয়াছে,—আর এই নিকট-কুটুম্ব জুয়াচুরি করিয়া তাহার এই কষ্টের হাড়-জল-করা পয়সা

আত্মসাৎ করিতেছে। দাশুর আর ধৈর্য্য বা বিবেচনা নাই! এ সংস্রবে যাহারা আছে, সকলেরই উপর সে জাতক্রোধ হইয়া উঠিয়াছে! তাই সে পলাইবে।

সকাল হইতেই সে দুঃসহ প্রতীক্ষায় রাত্রির অপেক্ষা করিতেছিল। দেহে জ্বর না থাকা সত্ত্বেও সে জ্বরের ভাণ করিয়া, চুপ করিয়া শুইয়া-শুইয়া, তাহার স্ত্রী, কন্যা ও মাতার মুখ স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। আবার সে বাড়ী ফিরিবে! আবার আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হইবে! আবার আপনার আজন্ম-পরিচিত গ্রামের পথে সে চলিবে! এই কল্পনা—উগ্র মদের মত তাহাকে সারাদিন মাতাল করিয়া রাখিয়াছিল।

এই শক্ত পাহারার জেলখানা হইতে সে নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিবাদে পলাইবে—মুক্ত হইবে—এই সমস্ত নরখাদকদের চক্ষুতে সে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে, ভাবিতে-ভাবিতে সে সময়ে-সময়ে অজ্ঞাতে হাসিয়া ফেলিতেছিল; কখন-কখন অজ্ঞাতসারে হস্ত-পদাদিও আস্ফালন করিতেছিল। গোপনে সে পাক করিয়া খাইতে বসিল; কিন্তু মনের অব্যক্ত আনন্দে সে ভাল করিয়া খাইতেই পারিল না। তাহার মনে আর অন্য কোনও চিন্তাই ছিল না,—কেবল একবার সন্ধ্যা লাগিলেই, গা-ঢাকা আঁধার হইলেই, সে বাহির হইয়া পড়িবে।

অন্ধকারও হইল ঘুটঘুটে সেদিন। দাশু ভারি খুসী। সে, তাহার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কোনও রকমে কম্বলখানায় জড়াইয়া মাথায় করিয়া, "জয় মা সিদ্ধেশ্বরী" বলিয়া আপনার কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

তাহার হৃৎপিণ্ড ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া আঘাত করিতে লাগিল; কাণ বোঁ বোঁ করিতে লাগিল; গায়ে স্বেদোদ্গম হইতে আরম্ভ হইল।

প্রথমটা খুব আস্তে-আস্তে চারিদিক দেখিতে-দেখিতে চলিতে লাগিল; ক্রমশঃ তাহার পদক্ষেপ দীর্ঘতর হইল,—শেষে সে রীতিমত দৌড়িতে লাগিল। কতবার হোঁচোট খাইল, কত-বার উঁচু-নীচু স্থানে পা পড়িয়া পড়িয়া গেল, পড়িতে-পড়িতে বাঁচিয়া গেল—তবু ভ্রূক্ষেপ নাই। দৌড়িতে দৌড়িতে কোন্‌ পথে আসিয়া পৌছিল, তাহাও খেয়াল নাই। কোন্‌ পথে যে যাইতে হইবে, তাহাও সে জানে না! তবু ছুটিয়াছে—এই অনির্দ্দেশ, নিরুদ্দিষ্ট পথে ছুটিয়াও তাহার সান্ত্বনা; কেন না, সে মুক্ত! তাহার ছয় বৎসরের কারা-ক্লেশের আজ অবসান!

কতটা পথ, কোন্‌ দিকে, কত রাত্রি কিছুই দাশুর খেয়াল না থাকিলেও, তাহার বিশ্বাস, সে এখনও বেশী দূর আসিতে পারে নাই। এখনও সে বাগানের অতি-নিকটে;—হয় ত সবাই জানিতে পারিয়াছে যে, দাশু পলাইয়াছে। লোক বুঝি ছুটিল! পিতলের-তক্‌মা-ঝুলান, চাপকান্‌পরা, পাগ্‌ড়ী-আঁটা চাপ্‌রাশীরাও তাহার পিছু লইয়াছে। তাহারা সুস্থ, সবল,—খালি হাতে আসিতেছে;—তাহারা বেশ দৌড়িতে সমর্থ; কিন্তু দাশুর যে নানা বাধা! কি করে! সে বেগ বাড়াইয়া দিল। ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িতে লাগিল। এখন তাহার ভাবনা যে, ধরা পড়িলে,—যে-কষ্ট তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহাই যে দ্বিগুণ হইবে। অতএব যখন পলাইয়াছে তখন পলাইতেই

হইবে। সে ঝড়ের মত দৌড়িতে লাগিল। যত দৌড়ায়, ততই মনে হয়, যেন সে চলিতেই পারিতেছে না।

কেবলি তাহার মনে হইতেছিল, যেন তাহার পিছু পিছু আরও কে একজন সমান বেগে ছুটিতেছে! মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া তাকায়, কাহাকেও দেখিতে পায় না—তবু ছুটে। সে যে কত কাছে, তাহার পায়ের শব্দ শোনা যায়, কিন্তু লোক দেখা যাইতেছে না। হয়ত অন্ধকারে! দাশু তাহার দৌড়ের বেগ আরও বাড়াইয়া দিল! সংজ্ঞাহীন উন্মত্তের মত ছুটিতে-ছুটিতে একঝাড় কালকাসিন্দা গাছের উপর সজোরে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। মাথার বোঝা তাহার আরও বহু আগে গিয়া সশব্দে ছিটকাইয়া পড়িল। সত্য-সত্যই সে এতক্ষণে অজ্ঞান!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যখন তাহার জ্ঞান হইল—তখন বেলা প্রায় আটটা। তাহার চারিদিকে অসংখ্য লোক,—মায় পুলিশ পর্য্যন্ত উপস্থিত !

চক্ষু চাহিয়া দেখিয়াও সে প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না। কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না! সর্ব্ব-শরীরে তাহার প্রচণ্ড বেদনা। সে যে কি করিয়াছে, এবং কোথায় আসিয়াছে, এবং কেন এরূপ হইয়াছে, কিছুই মনে করিতে পারিল না !

সমাগত লোকেদের মধ্য হইতে কতজনে কত কি তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—সে প্রশ্নও ভাল বুঝিতে পারিল না—কথার উত্তর দিবারও তাহার সামর্থ্য ছিল না ! সকলে আস্তে-আস্তে কথা বলার দরুণ একটা যে কলরব উঠিতেছিল, তাহা সে ধরিতে পারিতেছিল না। একবার উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহাও না পারিয়া, বিহ্বল নেত্রে লোকগুলির পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া সকরুণভাবে সে চাহিয়া রহিল।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছেলে-ছোকরাই বেশী,—বয়স্ক লোক দুই-চারিজন। ছেলেরা কৌতুহলী হইয়া দাশুর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া নির্ব্বাক্,—আর মাতব্বররা মধ্যে-মধ্যে ছড়ান জিনিষগুলির পানে কটাক্ষ হানিতেছেন , এবং সন্দিগ্ধভাবে অন্য একজনকে ইঙ্গিত করিতেছেন—আর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মধ্যে মধ্যে দাশুর মুখ পানে চাহিতেছেন।

ফিস্‌ফিস্ জটল্লায় সুখ কোনও দিনই নাই। কাজেই আলোচনাটা

মা দুর্গার মত হঠাৎ দশভূজা মূর্ত্তি ধারণ করিল। বৃদ্ধের মধ্য হইতে কেহ বলিল, চোর, কেহ বলিল, খুনে; কেহ বলিল, বদমাইস। কিন্তু কিছু মীমাংসা হইল না,—যাহা এদেশে কোন বিষয়ে কখনও কোন দিনই হয় না, বিশেষতঃ সিদ্ধান্তপঞ্চানন দারোগাবাবুও যখন আসিতেছেন। ছেলেদের পক্ষ হইতেও বিচার হইতে লাগিল। কেহ বলিল, বোবা, কেহ বলিল, একেই কে মেরে সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে গেছে; কেহ বলিল, কি জানি! একজন কলেজের ছাত্র ছিল, সে বলিল, ডিটেক্‌টিভ্‌ নয় ত? সহসা সকলের দৃষ্টি কথক মহাশয়ের উপর পড়িল এবং সকলের অন্তরেই অপ্রত্যক্ষভাবে একটা অহেতুকী ভীতির মন্দ হাওয়া বহিয়া গেল। বেশ একটু চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। এমন সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে দারোগাবাবু আসিয়া হাজির। সকলে অতি ভক্তিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন অভ্যর্থনা করিলেন।

দারোগার আগমনের পর সকলেই চুপ করিল। সমাগত জনসংঘের পিছন দিক হইতে লোকও ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। দারোগা অনেক প্রশ্ন করিল; দাশু কোন উত্তর দিতে পারিল না। অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দারোগা বলিল, "লোকটার যে খুব জ্বর! আপনারা সব এতক্ষণ কি তামাসা দেখছিলেন? লোকটা যে মরে!" সম্মুখস্থ সকলের মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। কেহ গলা ঝাড়িতে, কেহ ঘাড় নাড়িতে এবং কেহ হাত কচ্‌লাইতে লাগিলেন।

"ওরে হরে, যা,—শীগ্‌গীর একটা ডুলি কি পাল্কী যা হয় জনচারেক বেহারা সুদ্ধ এখুনি নিয়ে আয়। একে থানায় নিয়ে যেতে হবে। আমি এই গাছতলায় বস্‌ছি। যাবি আর আসবি।" হরিদাস ওরফে

হয়ে চৌকিদার সমস্ত কথাটা না শুনিয়াই দৌড়িল। দারোগাবাবু রুমাল দিয়া ঝাড়িয়া গাছতলে উঁচু শিকড়টির উপর বসিয়া অন্যদিকে চাহিয়া সিগারেট ধরাইলেন।

পশ্চাদ্দিকে দণ্ডায়মান লোকগুলি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উস্‌খুস্‌ করিল, কাসিয়া গলা ঝাড়িল, অকারণ দুই একটা শব্দ করিল; কিন্তু দারোগা বাবু ফিরিয়া চাহিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রায় একমাস কাল হাসপাতালে থাকিয়া দাশু নীরোগ হইল। দারোগাবাবু দাশুর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। দাশু আবার দেশের পথে চলিল।

থানা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দাশু যে কয়টা দিন সেখানে ছিল, তাহার মধ্যে সে সকলেরই বড় অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই দয়াপরবশ হইয়া যাইবার সময় তাহাকে কিছু-কিছু দিল। দাশু রেলগাড়ীতে চড়িল।

সকলেই তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, নৈহাটী ষ্টেশনে টিকিটখানি দেখাইয়া যেন অন্য গাড়ীতে চড়ে; টিকিটখানি যেন হস্তান্তরিত না করে; কিন্তু বর্দ্ধমানবাসী মালোনন্দন দাশরথি নৈহাটীতে টিকিটখানি টিকেট কালেক্টারকে দিয়া সকলের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর যাহা হয়, তাহাই ঘটিল। আবার অকূল সমুদ্রে পড়িল। রেলের বাবুদিগকে, খালাসীদিগকে, কুলিদিগকে পর্য্যন্ত অনেক অনুনয়-বিনয় করিল; কেহই তাহার টিকিটখানি আর ফিরাইয়া দিল না। সে চারি আনা পর্য্যন্ত পান খাইতে দিতে পারিত, তাহাও দিতে স্বীকৃত হইল কিন্তু বাবু আরো কিছু বেশী প্রাপ্তির আশায় তাহাতে রাজী হইলেন না। দাশু চলিয়া গেল। আপনার হতভাগ্যকে ধিক্কার দিতে-দিতে দাশু বাহিরে গেল—যদি কোন সুরাহা হয়। কিন্তু দাতা পৃথিবীতে এত

সুলভ নয়। দাশু পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিল। সারাদিন পথ চলে ক্ষুধা পাইলে কিছু মুড়িমুড়্কি কিনিয়া খায়; বৃক্ষতলে শয়ন করে; অথবা কোন লোকের বহির্বারান্দায় রাত্রিযাপন করে; আর প্রভাত হইলেই চলিতে আরম্ভ করে।

পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল। দাশু মাত্র ছয় আনা পয়সা সম্বল করিয়া নৈহাটী হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন মতে জীবন রক্ষা করিয়া সে চলিতেছিল। কিন্তু আজ সে একেবারে কপর্দ্দকহীন। যেখানে আসিয়াছে, এখান হইতে তাহাদের গ্রাম বারো ক্রোশ মাত্র, তবু আপন জেলায় ত! যে কোন উপায়ে সে বাড়ী পৌঁছিবেই, এই আনন্দে ও উৎসাহে সে দিন খালি পেটেই সে চলিতে লাগিল। যখন বড় পিপাসা পায়, তখন একবার পেট ভরিয়া জলপান করে। ক্ষুধায় চোখে অন্ধকার দেখিলেও ভিক্ষা করিতে মন সরিতেছিল না। অনেকবার মনে করিয়াছে যে, অন্য কোথাও না গিয়া কোনও ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া যদি দুই মুঠা প্রসাদ যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে অন্যায় কি হয়, বা তাহাতে তাহার লজ্জাই বা কি; সে যে মালো—ব্রাহ্মণের দাসানুদাস কিন্তু তবু পারিল না। ফলে, সে সারাদিন অভুক্ত রহিয়া গেল।

একে মাঘ মাস, শীতকাল—তাহাতে সমস্ত দিন না খাইয়া পথ চলিয়াছে; কাজেই অপরাহ্নে দাশু একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। শীতের প্রবল হাওয়ায় তাহার হাত, পা, মুখ, ঠোঁট সব ফাটিয়া গিয়াছে; তৈলাভাবে কৃষ্ণ দেহবর্ণ আরো কৃষ্ণ এবং রুক্ষ হইয়াছে; পদতল ফাটিয়া কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে; পেট ধক্-ধক্ করিতেছে। দৌর্ব্বল্যে মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছে না। এই অবস্থায় দাশু একটি গ্রামে

প্রবেশ করিয়া একজনের বাহিরের দাওয়ায় হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বসিয়া পড়িল। কোমর টন্‌টন্ করিতেছিল, শরীর অবশ অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল; বেশীক্ষণ বসিতে পারিল না, পুঁটুলিটি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল এবং অচিরে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মৃতের মত ঘুমাইতে লাগিল।

হঠাৎ দাশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঢোল কাঁসি চড়বড়ে নাগরা রামশিঙা প্রভৃতি বাজাইয়া, বিপুল কোলাহল করিয়া, মশাল রং-মশাল বোম্ তুবড়ি প্রভৃতি রোশ্‌নাই করিতে-করিতে মহা সমারোহে এবং সোরগোলে উত্তরপাড়ায় বিরাট বাহিনী সহ একটি বর আসিল।

দাশু প্রথমে মাথাটি তুলিয়া এদিকে-ওদিকে চাহিয়া, ব্যাপারটি কি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পুনর্ব্বার যথাস্থানে মস্তক স্থাপিত করিয়া, চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিল। তখন তাহার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল, এবং ক্ষুধায় জঠর জ্বলিয়া যাইতেছিল। খোলা বারান্দায় শুইয়া শীতে কাঁপিতেছিল, দাশু কম্বলটা ঢাকিয়া ভাল করিয়া আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া পাশ-ফিরিয়া শয়ন করিল। খানিকক্ষণ রহিল, কিন্তু ঘুম আসিল না বা কাঁপুনিও থামিল না। তখন বিবাহ-বাড়ীর কলরবটা কয়েক পর্দ্দা নীচে নামিয়া কোলাহলে পরিণত হইয়াছে। দাশু উঠিয়া বসিল।

খানিকক্ষণ একমনে কি ভাবিয়া চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কম্বলখানি বেশ করিয়া দেহে জড়াইয়া দাশু বিবাহ-বাড়ীর দিকে টলিতে-টলিতে গমন করিল। বিবাহ-বাটীতে পৌঁছিয়া সে দেখিল যে, তখন বরযাত্রীদিগকে আরো রসগোল্লা কিম্বা পানতুয়া অথবা একটু ক্ষীর খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি চলিতেছে। বরযাত্রীরা যতই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, ততই অনুরোধ প্রবলতর হইতেছে। কেহ-কেহ

পাতের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মিষ্টান্ন প্রত্যাখ্যান কারতেছেন। দাশু নিষ্পলক নেত্রে দূর হইতে একমনে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে একেবারে তন্ময়। বরযাত্রীরা যখন উঠিয়া পড়িল, তখন দাশুর চমক ভাঙিল এবং একেবারে সে বসিয়া পড়িল। ক্ষুধায় তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

পনের খানি গো-শকটে বরযাত্রীরা শুভাগমন করিয়াছেন; তাহার পনের জন চালক, পাল্কী-বেহারা, ভৃত্য, নাপিত প্রভৃতি বরপক্ষীয় ব্যক্তিও বড় কম ছিল না। তাহাদেরও কন্যার পিতার গৃহে আজ জামাতার মত সমান আদর; কাষেই ব্রাহ্মণাদি বরযাত্রীদের ভোজন শেষ হইতে না হইতেই ইহাদের ডাক পড়িল। ইহারা অমনি, "দাদারে", "রামখুড়ো", "হারুজ্যাটা", "ম'তো", "মাধা" প্রভৃতি আজন্ম-কথিত সম্বোধনে বেশ একটি হাঁকাহাঁকি বাধাইয়া দিল। অনুপস্থিতদের মধ্যে সকলেই প্রায় যথা-তথা শয়িত এবং নিদ্রিত। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়াও যখন সকলকে একত্র করা গেল না, তখন দুই এক জন বিশিষ্ট শকট-চালক তাহাদিগকে অপ্রস্তুত খাদ্য খাওয়াইতে-খাওয়াইতে প্রস্তুত খাদ্যের জন্য ডাকিতে গেল। যাহারা রহিল, তাহারা শীতে, ক্ষুধায় অনিদ্রায় এবং দৈবলব্ধ সুখাদ্য-ভোজনে বিলম্বহেতু হাই তুলিয়া, হি-হি করিয়া চোখ্ রগড়াইয়া অসন্তুষ্টচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল; কেহ কেহ সেইখানেই উপুড় হইয়া বসিয়াও পড়িল।

খালি-গায়ে একখানি র‍্যাপার জড়াইয়া, খালি-পায়ে, পরিহিত বসন-খানি অজানু-উত্তোলিত কন্যাকর্ত্তা মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত লোকগুলিকে পরিতৃপ্তি-সহকারে আহার করিতে এবং যে দ্রব্য প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া লইতে অনুরোধ করিয়া আবার তাড়াতাড়ি চলিয়া

গেলেন। যাইতে-যাইতে জনৈক পরিবেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় বলিয়া গেলেন, যেন বরপক্ষীয় লোক ছাড়া বাহিরের কোন লোক এখন না বসে, দাশুর মাথা ঘুরিতেছিল; সে অতর্কিতে একটু সরিয়া অদূরে অন্ধকার পানে গিয়া বসিয়া পড়িল। দাশু স্থির করিয়াছে যে, সে-ও এই সঙ্গে বসিবেই; কারণ তাহাকে কোন পক্ষই চিনে না, আর চিনিলেও, সে পশ্চাৎপদ নহে, কারণ বড় ক্ষুধা। সে আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না।

পাতা পড়িল। দাশুও একখানি পাতা লইয়া বসিয়া পড়িল। ভোক্তারা দাশুকে মনে করিল কন্যাপক্ষীয় কেহ, পরিবেষ্টা ভাবিল বরপক্ষীয় ব্যক্তি। পাতায় জল ছিটান হইতেছে, এমন সময় বরকর্ত্তা মহাশয় শাল-গায়ে, পায়ে খড়ম, একটা ডাবা হুঁকা হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন,—"দেখো ঈশেন, তোমার উপর সব ভার, কেউ যেন চীৎকার গোলমাল করো না। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বসে খাও, যা পাবে, তাই নিও; গুচ্ছের নিয়ে পাতে ফেলে কোন জিনিস যেন আপ্‌চো ক'রো না। মাঝডাঙ্গার চাটুজ্জেদের যেন মুখ হাসিও না।"

দাশু নতমুখে পাতে লুচিগুলি গোছ করিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করে নাই। কিন্তু হঠাৎ মাঝডাঙ্গার নাম শুনিয়া তড়িতাহতের মত দাশু শিহরিয়া উঠিয়া বরকর্ত্তার মুখপানে চাহিল। তাহার বুক ধরাস্-ধরাস্ করিতেছিল, মাথার মধ্যে ঝিম্-ঝিম্ শব্দ হইতেছিল। সে আহার ভুলিয়া আবিষ্টের মত একদৃষ্টে চাটুজ্জে মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া ঘামিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে স্তম্ভিত থাকিয়া, এক লম্ফে চাটুজ্জে মহাশয়ের

পদপ্রান্তে আসিয়া, তাঁহার চরণ-যুগলে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল, "খুড়োঠাকুর!"

প্রথমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন—"কে, কে?"

দাশু কাঁপিতে-কাঁপিতে অতি-কষ্টে কহিল,—"আমি দাশরথি, মাধবদাসের ছেলে।" দাশুর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চিন্তিত হইয়া দাশুর মুখের পানে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া কহিলেন—"দাশরথি, মাধবের ছেলে? কৈ, আমি তো চিন্‌তে পারলাম না বাপু! কোন্ পাড়ার তোমাদের বাড়ী বল তো?"

দাশু তখনও ভাল করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই; বলিল— "মালোপাড়ায় আমাদের বাড়ী। নারান্‌দা' ঠাকুরের পৈতের সময় আমরাই খুড়ো-ঠাকুরকে মাছ দিয়ে'লাম।—"

"ওঃ! দাশু, দাশু, তাই বল্। তুই এখানে কোত্থেকে, তোকে যে আমি চিন্‌তেই পারি নাই।"

দাশু বাঁচিল। কহিল—"সে অনেক কথা খুড়ো-ঠাকুর, আমার মা-'রা সব ভালো আচে-তো?"

ভোক্তাদের দল হইতে এক জন হাত চাটিতে-চাটিতে বলিয়া উঠিল— "সে কি-রে দেশো, তোরি বাবার ছ' তিন মাস পরেই তো তোর মা, ইস্তিরী আর তোর মেয়ে যে তোর কাছেই গিয়েচে, সেই পাঁড়েজী এসেই তো নিয়ে গিয়েচে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তাইতো শুনেচি আমিও।

তোর খুব ভাল চাকরী হয়েছে নাকি ?—ও কি, ও কি, অমন কচ্চিস্ কেন ?”

হতাশভাবে দাশু বলিল,—“চাক্‌রী কোথা খুড়োঠাকুর, আমাকে ভাঁড়িয়ে,—সে শা—চা-বাগানে আমাকে কুলিচালান দিয়েলো।”

দাশুর হাত-পা অসাড় হইয়া গেল। সে বসিয়া পড়িল। কপালে করাঘাত করিয়া দাশু কাঁদিয়া অস্ফুটস্বরে একটা শুষ্ক শব্দ করিল। দু’ একজন লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হতভম্বের মত হুঁকাটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোর মা-মেয়েরা তবে—”

“আর মা-মেয়ে খুড়োঠাকুর! তবে আর কার জন্যে আসা ?” বলিতে-বলিতে দাশু সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

“ওরে, ওরে, খেয়ে-নে আগে। দাশু, দাশু, দাশু। মূর্চ্ছা গেল না-কি ?”

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, বিবাহের বর, নারায়ণ কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে উচ্চশ্রেণীতে পড়িত। এই গোলমালে সে-ও আসিয়া পড়িল। একটু নাড়াচাড়া করিয়া নাড়ী ও বক্ষঃ পরীক্ষা কহিল—“হার্ট ফেল্ ক’রে মারা গেছে! হঠাৎ কোনও ‘শক্’ পেয়েছিল নাকি ?”

চিঠির মাশুল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্ব্বেশ্বর ভোল ছিল পঞ্চাশ টাকা বেতনের সাবপোষ্ট-মাষ্টার। বেশ সুস্থ সবলকায়, বয়স মাত্র আটত্রিশ। ডাকঘরের অন্যান্য পোষ্টমাষ্টারদের জীবন যেমন একঘেয়ে, সর্ব্বেশ্বরের তাহা ছিল না। সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেতার বাজাইত, ছেলে-মেয়েদের হার্ম্মোনিয়ম সংযোগে গান শিখাইত, স্থানীয় ভদ্রলোকদের বাড়ী বেড়াইতে যাইত, গল্প করিত, হাসিত এবং এমন কি সুযোগ পাইলে থিয়েটারের রিহার্সাল পর্য্যন্ত দিত। এই সব কারণে, যেখানেই সে থাকিত, সেইখানেই অতি অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজন-পরিচিত হইয়া পড়িত। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

হঠাৎ সর্ব্বেশ্বরের এক দিন একটু জ্বর হয়; এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল, জ্বর ছাড়িল না। জ্বর লইয়াই অফিসের কার্য্য করে, কার্য্য শেষে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়ে! যেখানে এই পোষ্ট অফিস সে একটা মহকুমা। সরকারী ডাক্তার আছে। ডাক্তার বাবু সংবাদ পাইবামাত্র আসিলেন। চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সাত দিন কাটিল। জ্বর ছাড়া দূরে থাকুক, আরও অন্যান্য অনেক উপসর্গ আসিয়া জুটিল। সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী দামিনী বড় ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, ছুটির দরখাস্ত করুন। দরখাস্ত হইল। ৩১৪

দিনে নিউমোনিয়া স্পষ্ট রূপে যখন আত্ম-প্রকাশ করিল, তখন টেলিগ্রাফ করা হইল, ক্রমে ডাকঘরের কায বন্ধ হইল—কারণ এ অফিসে সর্ব্বেশ্বরই সর্ব্বেশ্বর ছিল; তাহার অধীনে তিনটি পিয়ন ও দুইটি ডাকহরকরা ছিল মাত্র। প্রায় রোজই একখানি করিয়া টেলিগ্রাম হইতে লাগিল, কিন্তু ডাকঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নীরব। এগার দিনে সর্ব্বেশ্বর জন্মের মত চক্ষু বুঁজিল, সংসারের সব বাঁধন কাটাইল, কিন্তু ডাকঘরেব বাঁধনটি আর কাটিল না! তিনটি ছোট ছোট মেয়ে, কোলে একটি শিশু পুত্র ও ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র গোকুলচন্দ্রকে লইয়া দামিনী চক্ষে অন্ধকার দেখিল। একে অর্থাভাব, তাহার উপর এই মহাবিপদ, আর এই বিদেশ. —কি যে করিবে ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। আপনার বলিতে সর্ব্বেশ্বরের কেহই ছিল না। দেশে বৰ্দ্ধমান্ জেলার কাটোয়া মহকুমার সুদূর পল্লীতে একখানি কাঁচা মাটীর বাড়ী আছে মাত্র—তাহাও বোধ হয় এত দিনে পড়িয়া গিয়াছে! কারণ বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বেশ্বর দেশেও যায় নাই, বাড়ীখানির মেরামতও হয় নাই।

স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সকলেই এই দুর্দ্দিনে এই বজ্রাহত পরিবারটিকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন। অনেক বাড়ীর মেয়েরাও আসিলেন। নানা কথায় সকলেই প্রবোধ দিতে লাগিলেন। প্রবোধ দেওয়া যত সহজ, প্রবোধ পাওয়া ততোধিক শক্ত। কিন্তু তবুও মানুষ বন্ধুবান্ধবকে চিরদিনই দিয়া থাকে। দশজনের সহানুভূতিতে অশ্রুজলে ও সমবেদনায় —বুকের ভার কতকটা হাল্কা হয় বৈ কি!

"বল হরি, হরিবোল্"! গোকুল পিতার শেষ কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে ফিরিল। আবার দ্বিগুণ বেগে শোক-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এমন

সময়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তার আসিল—"Send medical certificate" (অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাও) গোকুল টেলিগ্রামখানি পড়িয়া, বাহিরের দাওয়ায় গিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিয়ন দুইজন বুঝাইতে লাগিল। তখন বেলা প্রায় চারিটা। অগ্রহায়ণ মাস। শীতের আমেজ পড়িয়াছে।

চতুর্থ দিনে নূতন পোষ্টমাষ্টার আসিল। চার্জ্জ লইয়া বলিল, ৪৩২॥৶৯ পাই তহবিলে কম। বিপদের উপর বিপদ। হাতে নগদ মোটে সতেরটি টাকা আছে। সাতখানি পাশ বইয়ে সর্ব্বসাকুল্যে ৬১৸৵১০ ও এই উনিশ দিনের বেতন মাত্র সম্বল। পিয়ন বলিল, পাশ বইয়ের টাকা ও এই কয় দিনের বেতন পাইতে এখনও বহু দেরী ; কারণ, এ সবের তদন্ত ইত্যাদি করিতে অন্ততঃ তিন মাস সময় লাগিবেই। এসব ইনেস্‌পেক্টার বাবুর দয়া !

সরকারী তহবিলে টাকা কি করিয়া কম হইল, কি দিয়া এ পূরণ হইবে—শোক অপেক্ষা এই চিন্তাই দামিনীর বুকে সজোরে চাপিয়া বসিল। এই তো সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! ভগবান আবার নূতন কি সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিলেন ? কে জানে !

নূতন পোষ্টমাষ্টারবাবু বেহারী তিনিও "ফ্যামিলি"—অর্থাৎ তিনি বিপত্নীক, এক কাহারিন্‌ অবিদ্যা লইয়া আসিয়াছেন। কোয়ার্টার তাঁহার চাইই। দামিনী স্বামীর সঙ্গে বহু দিন হইতে ঘুরিতেছে, —সে জানে যে, এ ঘরদুয়ারে তাহার আর অধিকার নাই। কিন্তু কোথায় যায় ? এই সব ছেলেপুলে লইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়ায় ? নূতন বাবু আসিয়া প্রথম দিন হইতেই কোয়ার্টার

খালি করিয়া দিতে বলিতেছেন, অথচ আজ দুই দিন হইয়া গেল।

গোপেন্দ্র মিত্র বড় উকীল, মস্ত বাড়ী—গোকুল মাতার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার কাছে গিয়া একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিল। তিনি দয়া করিলেন। এই হতভাগ্য পরিবার স্থান পাইয়া যত না খুসী হইল, পোষ্ট আফিসের ঘর ছাড়ায় তদপেক্ষা ঢের বেশী সোয়াস্তি অনুভব করিল; কারণ, নবাগতা গৃহাধিকারিণীটি এই দুই দিনেই ইহাদিগকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

গোপেন্দ্রবাবু বারলাইব্রেরীতে গিয়া অন্যান্য উকিলদের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া দিলেন—কোনও রকমে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা হইল। ওদিকে গ্রামে যাহারা সর্ব্বেশ্বরের জামিন ছিলেন, তাহারা সর্ব্বেশ্বরের পৈত্রিক ভিটাটি বিক্রয় করাইয়া, সরকারী তহবিলের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিয়াছেন—সংবাদ আসিল। শেষ যে একটু আশ্রয় ছিল, তাহাও গেল। এখন উপায় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোকুলের স্কন্ধে এখন বিধবা মাতা, পাঁচ, সাত ও নয় বৎসরের তিনটি ভগিনী ও দেড় বৎসরের একটি ভাই। তাহার বয়স মাত্র তের, সে হাই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল। বাড়ী নাই, ঘর নাই, দেশ নাই, অর্থ নাই—একেবারে নিরাশ্রয়। গোপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে বাস করিতেছে তিনিই খাইতেও দিতেছেন ; কিন্তু এ যেন তাহাদের উপবাসের যন্ত্রণা হইতেও অধিক যাতনাদায়ক মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এ যাতনার হাত এড়াইবারও উপায় ছিল না। পেটের জ্বালা যে পৃথিবীর সকল জ্বালার চেয়ে বড়।

দামিনী গোপেন্দ্রবাবুর পত্নীর নিকট প্রস্তাব করিল—"মা, তিনটে ঝি আর কি জন্যে? একটা ছাড়িয়া দাও। ওর কায আমিই করব।"

গৃহিণী খুব হিসাবী ; প্রকৃত পক্ষে এই সংসারের, এবং গোপেন্দ্র বাবুরও, তিনিই একমাত্র কর্ণধার। তিনি যদি একমুহূর্ত্ত অন্যমনস্ক থাকেন, তাহা হইলে গোপেন্দ্রবাবুর মত কিস্তিও বানচাল্ হইয়া যায়, বলিলেন— "না, না, তা'ও কি কখনো হয়? তোমরা আর কদ্দিনই বা আছ, আর কদ্দিনই বা থাক্‌বে এখানে?" কথা কয়টি তিনি খুব উদাসীন ভাবেই বলিলেন।

দামিনী বলিল—"না মা, যখন আপনারা ছিচরণে ঠাঁই দিয়েচেন্, তখন আর ঠেল্‌বেন্ না। আপনাদের বাড়ীর এঁটো মাজ্‌লে তো আর

আমাদের জাত যাবে না। আপনাদের পাতের চোতের দুটো ভাত কুড়িয়ে খেয়ে গোকুলের একটা হিল্লে লাগুক্, মা। অবিশ্যি আপনারা রাজা মানুষ—আপনাদের নর্দ্দমায় যে ভাত পড়ে থাকে, তাই খেয়ে আমাদের মতন একটা গেরস্ত মানুষ হয়ে যেতে পারে।" দামিনীর বুক ফাটিয়া কান্না আসিল।

প্রথম কথা কয়টি শুনিয়া গৃহিণীর মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা কি তবে আর উঠিবে না নাকি? কিন্তু শেষের মিষ্ট কথাগুলি শুনিয়া মনটা নরম হইয়া পড়িল। মনে মনে বলিলেন—"থাক্ গে না! হয় আহা, বাড়ীও বিকিয়ে গেল, যায়ই বা কোথা?" তোষামোদ না পারে, এমন কার্য্য সংসারে কি আছে? স্বয়ং ভগবানই যখন চাটুবাক্যে গলিয়া বর দিয়ে ফেলেন্, তখন মানুষের মন যে ইহাতে ভিজিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

দামিনী তৃতীয় দাসীর স্থানে নিযুক্ত হইল। গোকুলকে হেডমাষ্টার ছাড়িলেন না—বিনাবেতনে স্কুলে নাম লিখাইয়া লইলেন। নিজের বাসায় তাহাকে রাখিয়া দিলেন।

গোকুল সচ্চরিত্র ঠাণ্ডা ও খুব মেধাবী বালক ছিল। শিক্ষকেরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন—এবং সম্প্রতি তাহার পিতৃ-বিয়োগের পর একেবারে নিরাশ্রয় হওয়ায়, সকলেই তাহাকে একটু অনুকম্পার চক্ষে দেখিত।

গোকুল সর্ব্বদাই অত্যন্ত বিমর্ষ থাকিত। মুখখানা অস্বাভাবিক রকমে ভার করিয়া কি চিন্তা করিত, কথাবার্ত্তা নিতান্ত যাহা না বলিলে নয় তাহাই বলিত। এই শহরে যখন

তাহার পিতা পোষ্টমাষ্টার ছিল, তখন তাহার কতই না সম্মান ছিল। আর আজ সেইখানেই তাহার জননী দাসী ও সে অন্ত একজনের অন্নদাস গলগ্রহ ও বিনাবেতনের ছাত্র। সকলেই তাহাকে যে অযাচিতভাবে দয়া করিতে আসে, তাহাতেই গোকুল বড় মর্ম্মাহত হয় ও লজ্জা অনুভব করে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তো বলিতে পারে না যে ওগো তোমরা আমায় দয়া করে অনুকম্পা ক'রো না। যে-কথা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না, তাহার ব্যথা বড় নিদারুণ। গোকুল তাই এই লজ্জা, এই দুঃখ ও এই সব অপমান নীরবে সহ্য করে। আশা, যদি কখনও তাহার নিরাশ্রয়া স্নেহময়ী জননীর ব্যথা-ম্লান সততঅশ্রুনিষিক্ত মুখে আবার হাসি ফুটাইতে পারে! ভগবান সেদিন কি কখনও দিবেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। গোকুলচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইল। এইবার একটা চাকরী চাই।

দামিনী এখনও গোপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই কন্যা তিনটি ও শিশু পুত্রটি সহ দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত। দামিনী ছেলেমেয়েগুলি লইয়া গোয়ালঘরের পাশে ছোট একটা চালায় বাস করে ও দিবারাত্রি সংসারের কাজ করে, মেয়েগুলিও সংসারের ফাই ফরমাশ খাটে। গোকুল রোজ সন্ধ্যায় আসে, ছুটির দিন দুপুর বেলা আসিয়া মায়ের চালায় বসে; ভগিনীদের সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলে, মাতার কোলে মাথা রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে শয়ন করে; তারপর আস্তে আস্তে নীরবে চলিয়া যায়। কথা খুব কম বলে, হাসি তামাসা তো জানেই না। এই অকাল ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের জন্য সহপাঠীমহলে গোকুল একেবারে একঘরে। সকলেই বলে, "ভাল ছেলে বলে' ওর গরবে আর মাটিতে পা পড়ে না।" গোকুল শুনিত, কিছু বলিত না। সে বরং একাকী থাকিয়াই সুখী হইত।

পাশের খবর আসিল। গোকুলের মুখের ভাব একটুও পরিবর্ত্তিত হইল না। হেড্ মাষ্টার যতীন বাবু ও তাঁহার পত্নী কত আনন্দপ্রকাশ করিলেন, কত আশীর্ব্বাদ করিলেন—গোকুলের মুখ হইতে কোন কথা নিঃসৃত হইল না, কেবল তাহার নিষ্প্রভ নয়নযুগল হইতে দরদরধারে কয়েক ফোঁটা বড় বড় তপ্ত অশ্রুবিন্দু ভূপতিত হইল মাত্র।

দামিনী শুনিল; শুনিয়া কুটীর মধ্যে আসিয়া ফোপাইয়া ফোঁপাইয়া কাদিল। কোথায় সে, যাহার পুত্র আজ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে? সে যে শুধু দুঃখের বোঝাই চিরদিন বহিয়া গিয়াছে, এ সুখের দিনে কোথায় সে—কোথায় সে? ওগো—

দামিনীর ডাক পড়িল উপরে গিন্নির ঘরে। তাড়াতাড়ি সে চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল। গরীবের শোকেরও সময় নাই। এ আনন্দ নয়, এ শোক! এ তরঙ্গিনীর নয়ন-সুভগ উর্ম্মিবিলাস নয়, এ যে জলোচ্ছ্বাসের পূর্ব্বরাগ! এ চন্দনগিরির দক্ষিণানিল নহে, এ যে প্রলয়-প্রারম্ভের ঝঞ্ঝাদূত! গোকুল পাশ হইয়াছে, শোকসিন্ধু বহুদিন পরে আবার উথলিয়া উঠিল। এ গূঢ় রহস্য দুঃখী ছাড়া কে বুঝিবে?

গিন্নী আনন্দপ্রকাশ করিলেন, দামিনী কাঁদিয়া ফেলিল। গিন্নী গোকুলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—দামিনীর অশ্রুভারনত ছলছল চক্ষু দুইটি কৃতজ্ঞতায় জ্বলিয়া উঠিল। দাদার পাশের খবরে মায়ের এত কান্না কিসের, বড় মেয়ে তুলসী কিছুতেই অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে না পারিয়া, হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

গোকুল আসিলে কর্ত্তা গিন্নি হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর অন্যান্য চাকর-বাকরেরা পর্য্যন্ত গোকুলের পাশের খবরে আনন্দপ্রকাশ করিল, আশীর্ব্বাদ করিল ও অবিলম্বে এই শুভদিনের বারম্বার প্রত্যাগমন কামনা করিল—কিন্তু গোকুলের দৈন্য-ম্লান সঙ্কুচিত মুখখানিতে কোন রকম বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইল না। সে তাড়াতাড়ি মায়ের ঘরে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া বাঁচিল। শতচ্ছিন্ন অতিমলিন একখানি কাঁথার উপর আসিয়া ধপ করিয়া শুইয়া পড়িল, যেন কতই ক্লান্ত।

হর্ষে, বিষাদে, উত্তেজনায় ও ক্ষীণ ভরসার পুলকে দামিনীর আর সেদিন আহারে রুচি রহিল না—সে তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে ঢুকিয়াই শত চুম্বনে ও নীরব অকারণ অশ্রুনিষেকে গোকুলকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মাতা পুত্রে অনেক পরামর্শ হইল। স্থির হইল, যাহা হয় একটা চাকরী পাইলেই, এই হীন দাস্যবৃত্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়! চাকরী একটা চাই-ই।

গোকুল চাকরীর চেষ্টায় লাগিয়া গেল! সকাল হইতে দুপুর, আর বিকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরিয়া কোনও সুরাহা করিতে পারিল না। সকলে বলিল—কলিকাতায় যাও, সেখানে বহুৎ কায। বাহিরে এসব মফস্বলে, তাতে এই উড়ে ও মেড়োর দেশে, কি বাঙালীর ছেলের চাকরী হয় হে বাপু?

গোকুল গোপেন্দ্রবাবুকে বলিল। তিনি গাড়ীভাড়া দিলেন ও কলিকাতায় তাঁহার নিজ বাড়ীতে থাকিবার আদেশ দিয়া পত্র লিখিয়া দিলেন।

মাতার অশ্রুসিক্ত আশীর্ব্বাদ ও কম্পিত চরণের ধূলি লইয়া গোকুল শুভদিনে কলিকাতা যাত্রা করিল। দামিনীর আহার নিদ্রা ছুটিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠিক হেদোর ধারেই গোপেন্দ্রবাবুর বাড়ী। বড়লোক—চাকর দারোয়ান বেয়ারা মোটর সবই আছে। কলিকাতার বাসায় খবর পৌঁছিয়াছে যে, দামিনীঝির ছেলে গোকুল চাক্‌রীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিতেছে। বাঙালী ঝি চাকর মহলে ফিস্ ফিস্ চলিতে সুরু হইল।

গোকুল আসিয়া পৌঁছিল। গোবিন্দ খান্‌সামা, প্রথম নজরেই ভাবিল—এ একটা কি উৎপাত জুট্‌ল এসে? এ-ও হুকুম কর্‌বে না কি?

ভরত চাকর বিপদে পড়িল—সে ইহাকে "আপনি" বলিবে না, "তুমি" বলিবে?

ঝি অনুচ্চ কণ্ঠে কলতলায় বাসন মাজিতে মাজিতে এক নজর দেখিয়া লইয়া বলিল—"আমর, খেঁদীর বেটা পদ্দনোচন! মা খায় ভাড়া ভেনে—বেটা খায় এলাচ কিনে।"

গোকুল সপ্রতিভ। দুঃখেই সে মানুষ। জীবনের কৈশোর হইতে সে নিরাশ্রয়, জননী তাহার দাসী, ভগিনীরা তাহার পরান্নপালিতা, তাহাদের দুঃখ তাহাকে ঘুচাইতে হইবে,—হইবেই। অনেক দুঃখ অনেক লাঞ্ছনা সে সহ্য করিয়াছে, এখনও তাহার মা ও ভগিনী করিতেছে—সে কি দমিতে পারে? প্রথম দিনেই গোকুল বাড়ীর সকলেরই মনোভাব বুঝিয়া লইল। সে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত, খুব সাবধানে চলিত।

ঝি-চাকরেরাও তাহার নম্র ও সপ্রতিভ ব্যবহারে অবাক্ হইয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সহিত কোন্দল বাধাইতে সক্ষম হইল না।

দাসী-পুত্র যে পাশ করিয়াছে এবং বাবু হইয়া কলিকাতায় চাকুরী করিতে আসিয়াছে, এই চিন্তাটাকে কিছুতেই তাহারা হজম করিতে পারিতেছিল না। কাজেই তাহাকে খোঁচা মারিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতে সকলেই আশ্চর্য্য রকমে একমত হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রবাবু বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি গোপেন্দ্রবাবুর মামা; চিরকুমার, সদাচারী ও পরোপকারী—বয়স প্রায় ষাট বৎসর। তিনি এই ছোক্‌রাকে বড় সুনজরে দেখিলেন। গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াছে—ভদ্র ব্যবহার, অমায়িক স্বভাব, নম্র ধীর—তাঁহার বড় পছন্দ হইল। এই জন্য চাকর বাকরেরা প্রচণ্ড ইচ্ছাসত্ত্বেও গোকুলকে ইচ্ছানুরূপ আঘাত করিতে পারিতেছিল না।

গোকুল দশটায় আহারাদি করিয়া বাহির হয়, রাত্রি নয়টা দশটায় বাড়ী ফিরে। এ-আফিস ও-আফিস যায়, বড় বাবু, ছোট বাবু, মেজ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—কোনও সুফল তো ফলেই না, বরং কিছু অপমান ও গলাধাক্কা প্রত্যহই সঞ্চয় করিয়া, শেষে হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরে।

এক মাস কাটিয়া গেল, কিছুই হইল না। গোকুল হাল ছাড়িল না। দামিনীকে লেখে—এখনও কিছু হয় নাই, তবে শীঘ্রই একটা কিছু হইবে আশা করিতেছে। মাকে আশ্বস্ত করিতে হইবে তো?

আশার আলোক দেখা গেল। তখন যুদ্ধ চলিতেছে মেসোপোটেমিয়ার জন্য লোক সংগ্রহ হইতেছে!

গোকুল রিক্রুটিং আফিসে আসিয়া হাজির। তৎক্ষণাৎ তাহাকে মাসিক এক শত টাকা বেতনের চাকুরীতে নিয়োগ করা হইল।

গোকুল পথে আসিয়া মাকে পত্র দিল, বোম্বায়ের নিকট এক স্থানে মাসিক এক শত টাকা বেতনের এক চাক্‌রী ঠিক হইয়াছে, এক সপ্তাহ মধ্যেই সেখানে যাইতে হইবে। মেসোপোটেমিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যে যাইতে হইবে, এ কথাটি জননীকে গোকুল গোপন করিল।

এদিকের সমস্ত ঠিক করিয়া, এক দিনেব মত গিয়া সে মাকে দেখিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, গোকুল মেসোপোটেমিয়ায় কার্য্য করিতেছে। এখন তাহার বেতন হইয়াছে দুই শত টাকা। বেতনের সমস্ত টাকা তাহার মাতার নিকট যায়, সে শুধু সরকারী খোরাক পোষাকে কার্য্য করে।

গোকুলের এখন মুখে হাসি ফুটিয়াছে। দিবারাত্রি সে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে, অবসর পাইলেই সেই সুদূর ভারতসাগরের পরপারে বাঙ্গালী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজবে চিত্ত বিনোদন করে। কেবল তাহার দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়িলেই, তাহার চিত্ত অকারণ বিষণ্ণ হইয়া পড়ে এবং মাকে দেখিবার জন্য তাহার সর্ব্বশরীর সেই মুহূর্ত্তে অদৃষ্টপূর্ব্ব গৃহের প্রাঙ্গণে ছুটিয়া যাইতে চায়।

প্রতি ডাকে সে তাহার মাতার, ভগিনীর ও সাত বৎসরের ছোট ভাইয়ের বড় বড় লেখা পত্র পায়, হাজারবার করিয়া পড়ে, পাড়য়া আপনার খাকী উর্দ্দির পকেটে রাখিয়া দেয়, অবকাশ পাইলে আবার পড়ে। যত দিন না পুনরায় পত্র পায়, তত দিন পর্য্যন্ত শেষ পত্রগুলি এইভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পকেটেই থাকে।

মাতার পত্রে সে অবগত হইয়াছে যে, সুদ সমেত টাকা মিটাইয়া দিয়া দামিনী তাহার স্বামীর ভিটাটী পুনরায় হস্তগত করিয়াছে—বড় কন্যা তুলসীর বিবাহ দিয়াছে, জামাই রেলে ছোটবাবু আবার তুলসী সন্তান

সম্ভবা—শীঘ্রই সে মাতার কাছে আসিবে। মধ্যমা সরসীর বিবাহ হইয়াছে, জামাই জামশেদপুরে টাটা কোম্পানীতে ৪৫৲ টাকা বেতনে কায করে; ছোট ছেলে বৃন্দাবন পাঠশালায় পড়িতেছে, বড় দুষ্ট হইয়াছে।

শেষ পত্রে আর একটি খবর আছে। দীর্ঘ দুই বৎসর অদর্শন জন্য জননী বড়ই চিন্তিত ও একবার পুত্রের চন্দ্রবদন দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার বড় সাধ, যেন গোকুল একবার অন্ততঃ এক মাসেরও ছুটী লইয়া বাড়ী আসে! আর তিনি গ্রাম সন্নিকটস্থ আদিত্যপুর গ্রামের শ্রীহরিবাবুর কন্যার সঙ্গে গোকুলের বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি করিয়া রাখিয়াছেন। মেয়েটি বড় লক্ষ্মী ও টুকটুকে, যেন সরস্বতী ঠাকুরাণী।

শেষের কথা কয়টি গোকুলের প্রাণে এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুময় সঙ্গীতের সমারোহ রচনা করিয়া দিয়াছিল। প্রথম যৌবনের দৃপ্ত বাসনার বহ্নি-মুখে এ এক নবীন ইন্ধন-সম্ভার। গোকুলের মনটা অকস্মাৎ একটা পুলকের শিহরণে মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এ উত্তেজনা ক্ষণিক। মাতার ব্যাকুলতায় গোকুলের চিত্তও অধীর হইয়া উঠিল। সে আবার তাহার মাকে দেখিবে, আবার মাতার ক্রোড়ে শিশুর মত লুটাইয়া পড়িবে, দুঃখিনী জননীর শেষদৃষ্ট ম্লান মুখে তৃপ্তি শান্তি ও সুখের হাসি দেখিবে। নিজের বাড়ী যাইবে, নিজের ঘরে বাস করিবে, নিজের অর্জ্জিত অর্থের অন্নজল গ্রহণ করিবে—এ কি সাধারণ সুখ? তাহার নিজের বাড়ী, তাহার মাতা সেই গৃহের কর্ত্রী! স্নেহময়ী জননীর কর্ত্তৃত্বাধীনে সে বাস করিবে। ভগিনীরা তাহাকে

মুক্ত-হৃদয়ে আদর করিবে। জ্ঞান হইয়া অবধি এ সুখসৌভাগ্য গোকুলের কৈ হইয়াছে ? গোকুল বাড়ী যাইবার জন্য, মাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। এতটুকু বিলম্ব আর তাহার সহিতেছিল না।

সে ছুটীর দরখাস্ত করিল। ছুটি মঞ্জুরও হইল। মাকে পত্র দিল যে, তাহার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, শীঘ্রই বাড়ী পৌঁছিবে।

হঠাৎ আরবদিগের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়া উঠিল। ছুটি স্থগিত হইল, বাড়ী যাওয়া হইল না। অথচ গোকুল তাহার মাকে লিখিয়াছে যে, সে মাঘ মাসের ৭।৮ই নিশ্চয় বাড়ী পৌঁছিবে।

দামিনী হাতে স্বর্গ পাইল। বাড়ীতে বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইল!

* * -

আজ তিন দিন হইতে শত্রুপক্ষ বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দিবারাত্রি সমস্ত শিবির শত্রুভয়ে সন্ত্রস্ত। দিনেও কেহ তাম্বুর বাহির হইতে পারিতেছে না! সৈন্য ও শস্ত্র সংখ্যা হঠাৎ কম পড়িয়া যাওয়ায়, শত্রুপক্ষের খুবই সুবিধা হইয়াছিল। এদিকে বেস্ আফিসে তার করা হইয়াছে, এখনও সৈন্য ও শস্ত্রাদি আসিয়া পৌছায় নাই। প্রতি মুহূর্তেই সকলে আশা করিতেছে—এই এল, এই এল। (O. C) সেনাপতি সাহেব ম্লানমুখে তারঘরে বসিয়া অনবরত তার পাঠাইতেছেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ জ্বলিয়া ঘর আলো হইয়া উঠিল। শত্রুরা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিল। টেলিগ্রাফের দফা রফা!

সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল! তিনিও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে ভরসায় ডাকঘরে বসিয়াছিলেন, সে ভরসাও বিনষ্ট হইল।

অপরাহ্ন। মাঘ মাস। দারুণ শীত। সাহেব নিজ তাম্বুতে গিয়াই হুকুম দিলেন যে, পুনরায় হুকুম না দেওয়া পর্য্যন্ত বেলা ছয়টার পর শিবিরের কোনও স্থানে যেন কেহ কোনও প্রকার আগুন না জ্বালে। সমস্ত শিবির অন্ধকার থাকিবে। রান্না-খাওয়া অতএব সব ছয়টার পূর্ব্বেই শেষ করিতে হইবে। ঠিক ছয়টার সময় বিগল্ বাজিবে। অমনি সমস্ত আগুন, সমস্ত আলো এক সঙ্গে নিভিয়া যাইবে।

ছয়টা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে বিগল্ ধ্বনিয়া উঠিল। সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। বিপুল শিবির আশঙ্কায় ও অন্ধকারে ভয়াল হইয়া উঠিল। একটু শব্দ পর্য্যন্ত হইবার হুকুম নাই। সকলেই আপন আপন তাম্বুতে নীরবে অন্ধকারে মৃত্যুবিভীষিকা দেখিতে লাগিল। কেবল রক্ষী সৈন্যগুলি কালো পোষাক পরিয়া অন্ধকারে এখানে ওখানে শিবির রক্ষায় নিযুক্ত রহিল। বিরাট বিস্তৃত মরু-প্রান্তর—বাহিরে জনমানব নাই। সৈন্যগণ সশস্ত্র অবস্থায় শিবিরমধ্যে আদেশের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে। দেশ্‌লাই জ্বালিয়া একটি সিগারেট খাইবার পর্য্যন্ত হুকুম নাই।

মধ্যে মধ্যে হঠাৎ হুঙ্কারিত শত্রুদিগের গুলি আসিয়া তাম্বুতে, প্রাচীরে ও লৌহস্তম্ভে ঠং ঠং করিয়া লাগিতেছে। আর কোনও শব্দ নাই। এ মরুমধ্যে ঝিল্লি নাই, নৈশবিহঙ্গের ভীত চীৎকার নাই, বৃক্ষপত্রের শন্ শন শব্দ নাই। এহেন শব্দহীন গাঢ় অন্ধকারে নিদারুণ শীতে প্রতি-মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কায় প্রায় দশ সহস্র মানব-নন্দন জীবন্মৃত অবস্থায় বসিয়া আছে!

সেনাপতি সাহেব শিবির পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। নিঃশব্দ

পদসঞ্চারে তিনি ফিরিতেছেন—দেখিতেছেন, সৈন্যগণ ঠিক প্রস্তুত হইয়া আছে কি না, রক্ষী পাহারা সব যথাযথ আছে কি না, শিবিরমধ্যে কেহ কোনও সামরিকবিধানবহির্ভূত কার্য্যে লিপ্ত আছে কি না!

হঠাৎ গোকুলের শিবির-দুয়ারে আসিতেই দেখিলেন, ক্ষীণ একটু আলোকচ্ছটা তাহার দুয়ার-পর্দ্দার ফাঁক দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। সাহেব দাঁড়াইলেন। কাণ পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন—ভিতরে কোনও শব্দ নাই। দুয়ারে মৃদু শব্দ করিবামাত্র গোকুল পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়াই দেখিল—O. C (সেনাপতি সাহেব)।

গোকুলের বুকের রক্ত জমিয়া হিম বরফ হইয়া গেল। মাথা ঘুরিয়া উঠিল। হঠাৎ বাক্যনিঃসরণ হইল না।

সাহেব পর্দ্দা ঠেলিয়া তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া গোকুল পত্র লিখিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন,

—"কি করিতেছিলে?"

গোকুলের কণ্ঠতালু বক্ষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া পদতলস্থ মরু-বালুকার মত হইয়া উঠিয়াছিল। অতি কষ্টে উত্তর দিল—"আগামী কল্য প্রত্যূষে ভারতের ডাক যাইবে, তাই আমার দুঃখিনী মাকে একখানা পত্র দিতেছি। সারা দিন আমি ডিউটিতে ছিলাম, সময় পাই নাই। গত মেলেও শিবির-সংস্থান পরিবর্ত্তনের জন্য পত্র দিতে সময় পাই নাই; এবারেও যদি পত্র না দিই, তাহা হইলে আমার মা হয়ত আশঙ্কায় মারাই যাইবেন। তাই—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—"আজকের হুকুম কি?"

গোকুল কাঁপিতে লাগিল। কহিল—"ছয়টার পর কোনও আলো জ্বলিবে না। আমার—"

সাহেব বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"এ হুকুমের অর্থ কি জান?"

গোকুলের মাথা ঘুরিতেছিল,—কহিল—"অর্থ এই যে শত্রুপক্ষ না জানিতে পারে, কোথায় শিবির। জানিলে উড়োজাহাজে বোমা ফেলিয়া শিবির ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতে পারে।"

সাহেব বলিলেন—"ঠিক তাই! কতদিন তুমি এখানে আছ?"

গোকুল উত্তর দিল—"দুই বৎসরের উপর।"

সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, চিঠি শেষ করিয়া ফেল, আমি দাঁড়াইতেছি।"

গোকুল কহিল—"শেষ হইয়াছে। কেবল ঠিকানাটা বাকী।"

সাহেব কহিলেন—"শীঘ্র লিখিয়া আমায় দাও।"

গোকুল কি বুঝিল জানে না, মন্ত্রচালিতের ন্যায় ঠিকানাটী লিখিয়া পত্রখানি হাতে করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব গোকুলের হাত হইতে খপ্ করিয়া পত্রখানি লইয়া বলিলেন—"দাও, আমি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিব। এ চিঠির মাশুল লাগিবে না। আজ তোমার জন্য দশ হাজার লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইত, তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি?"

গোকুল সাহেবের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাতর স্বরে বলিল—"সাহেব, আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে, এইবারকার মত আমায় মার্জ্জনা কর।"

সাহেব বলিলেন—"বাতি নিভাও। দাঁড়াও, জানো যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির-আদেশ অবহেলার কি শাস্তি?"

কম্পিত কণ্ঠে গোকুল উত্তর দিল—"জানি, কোর্ট মার্শ্যাল্—"

গোকুল ফুৎকারে বাতি নিভাইয়াই অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেব চিঠিখানি লইয়া চলিয়া গেলেন।

* * *

ভোর পাঁচটায় বিগল্ বাজিল। সমস্ত সৈন্যগণ নিমেষে আসিয়া ময়দানে সারি দিয়া দাঁড়াইতেই সেনাপতি সাহেব গোকুলের গত রাত্রের কাণ্ড বুঝাইয়া দিয়া, সামরিক হুকুম অমান্যের শাস্তিও যে কি, তাহাও জানাইয়া দিলেন।

সৈন্যগণের মুখে একটা চাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিল।

প্রহরী-বেষ্টিত গোকুল তথায় নীত হইল। আবার বিগ্‌ল বাজিল। এগারজন সৈনিক গুলিভরা বন্দুক হস্তে গোকুলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার বাঁশী বাজিল, যুগপৎ এগারটি বন্দুকের শব্দ হইল। যাহারা গুলি করিল এবং যাহারা দেখিবার জন্য আনীত হইয়াছিল—তাহারা কেহই দেখিল না চক্ষের পলকে কি হইয়া গেল! কেবল বন্দুকের শব্দ শুনিল মাত্র।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হইল—"Right about turn, Quick march। (দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া, দ্রুত চলিয়া যাও।)

হরতাল

অভয় হাজরা ডঙ্কি-মিউল (Donkey Mule & Co.) কোম্পানীর কলিকাতা আফিসের একজন কেরানী, বেতন ৮০ টাকা। শ্রীরামপুর হইতে প্রত্যহ সে ৮-৫৭ মিনিটের গাড়ীতে কলিকাতা আসে, আর আফিস করিয়া ৭-১৯এর গাড়ী ধরিয়া বাড়ী ফিরে।

সংসারটি নিতান্ত ছোট নয়। নিজের পাঁচটি পুত্র কন্যা ও স্ত্রী ছাড়া ছোট দুইটি ভাই, একটি বিধবা ভগিনী, তাহার দুইটি বিবাহ-যোগ্যা কন্যা, বিধবা মাতা ও পিসি এবং এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনূঢ়া ভগিনী বিদ্যমান।

অতি কষ্টে কোনও রকমে মোটা ভাত ও মোটা কাপড়টা পর্য্যন্ত চলে—অন্য কোনও বিষয়ে কিছু বাড়্‌তি খরচ করিতে গেলেই, চক্ষু স্থির হইয়া উঠে। সম্পত্তির মধ্যে অভয়চরণ পাইয়াছিল, পৈত্রিক পুরাতন জরাজীর্ণ একখানি একতলা বাড়ী ও ৪।৫ বিঘা জমি। জমি ভাগে বিলি, তাহার ফসলের সিকি যায় চুরি অবশিষ্টের অর্দ্ধেক-মাত্র তাহার ঘরে আসে।

দুই ভাইই ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় তিন-তিনবার ফেল করিয়া, সম্প্রতি ঘরে বসিয়া দৈনিক রীতিমত চারিবার আহার ও ছয় বার চা পান করে, খাবার সময় ছাড়া সারাদিনই তাহারা বাহিরে থাকে এবং রাত্রে প্রায়ই থিয়েটার করে কিম্বা কনসার্ট-পার্টিতে বাঁশি ও করতাল বাজায়। তবে

দুইজনেই অবিবাহিত অভয় বলিয়াছে, চাক্‌রী না হইলে, সে কিছুতেই ভাইদের বিবাহ দিবে না।

অভয়চরণের শক্তি হইতে চিরকাল কল্পনাটাই খেলে বেশী। লোকটা ছিল কিছু ভাবপ্রবণ, অন্তরে সেবা ও দয়ার একটা ফল্গুস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইত, কিন্তু নিজের দারিদ্র্যের জন্য অভয় তাহার প্রকৃত মনোবৃত্তিগুলিকে সঠিক স্ফূর্ত্তি দিতে পারিত না, জোর করিয়া সেগুলিকে সে দাবিয়া রাখিত। তাই তাহার বিশ্বাস, সে একজন মস্ত লোক হইতে পারিত—যদি অকালে পিতৃবিয়োগজনিত সংসারের গুরুভার তাহার মাথায় না পড়িত। তবুও, অভয় অবসর পাইলেই লেখাপড়া করে, এবং সাধ্যমত পরোপকারে কখনই কুণ্ঠিত হয় না। গ্রামে মৃতদাহ করিতে ও প্রতিবেশীদের কোনও ক্রিয়াকাণ্ডে বাজার করা হইতে লোক খাওয়ান পর্য্যন্ত, অভয় ভিন্ন সুসম্পন্ন হওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল।

১৯০৮ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, অভয় একবার স্বদেশীর দলে খুব ভিড়িয়াছিল। দেশের দুর্দ্দশায়, জাতীয় অধঃপতনে এবং 'দীর্ঘ সপ্তশতাব্দী'র পরাধীনতায় তাহার প্রাণ এমন ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল যে, অভয় দেশভক্তিতে এবং জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া, একেবারে বোমা-তৈরির আড্ডা মুরারি-পুকুরের বাগানে আসিয়া বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুয্যে, হেমদাস প্রভৃতির সহকারীরূপে ভর্ত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তখন অভয়ের পিতা জীবিত ছিলেন; পুত্রের এবং দেশের শত্রুতাসাধন করিয়া তিনি পুত্রকে ধরিয়া আনিয়া একটি বয়স্থা কন্যার সহিত জোর করিয়া বিবাহ দিয়া, নিজের আফিসে লইয়া গিয়া, বড় সাহেবকে অনেক বলিয়া কহিয়া, ৩০ টাকা বেতনে,

একটী চাকরীতে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথমটা অবশ্য সে পিতার উপর খুবই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু বৎসর দুইয়ের মধ্যেই তাহার মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সেই হইতে অভয়ের মনে দেশ-ভক্তির একটা কাঁটা ফুটিয়াই ছিল। তবে বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশবৃদ্ধির চাপে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধির অভাবে, অভয়ের মনের সব সতেজ আশাগুলি একে একে মরিতে লাগিল। এখন তাহার মনে কোনও কল্পনা নিশ্চিত ফলবতী হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, সেদিকে মনোনিবেশ করিতে আর তাহার সামর্থ্যে ও ও সঙ্গতিতে কুলায় না। আগে এমন ছিল না, এখন কোনও একটা কাজ করিবার আগেই অভয় তাহার লাভলোকসানের ফলাফলটা খতাইতে বসে। কি করিয়া সে এমন সাবধানী ও হিসাবী হইয়া পড়িল—তাহা সে নিজেই ভাবিয়া পায় না।

কাজেই, এখন অভয়ের একমাত্র সংসারচিন্তা এবং সর্ব্বচিন্তা মূলাধার অর্থচিন্তা ছাড়া, আব দ্বিতীয় কোনও চিন্তাই এক প্রকার ছিল না বলিলেও হয়। আর্থিক উন্নতির হালফিল তেমন সহজ সরল ও অনায়াস-সাধ্য উপায় কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া, অভয় আজ বিগত এগার বৎসরকাল নিয়মিত ভাবে দশ টাকা দিয়া একখানি করিয়া ডার্বি টিকিট লয়; উদ্দেশ্য, যদি প্রথম পুরস্কারটা কোনও রকমে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে, এ জীবনের মত তাহার সংসারের অর্থকষ্ট তো ঘোচেই, উপরন্তু আমরণকাল একটু আরামে বাস করিয়া, একবার নিশ্চিন্তে মরিতে পারে। চিরটাকাল তো কষ্টেই গেল—

এইজন্য টিকিট কিনিয়াই, অভয় প্রথম পুরস্কারের প্রায় সাত লাখ

টাকা কি ভাবে ব্যয় করিবে, কি করিবে, কোথায় রাখিবে প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলির রীতিমত একটা হিসাবের ফর্দ্দ মুশাবিদা করে। যতদিন না উক্ত লটারীর ফলাফল বাহির হয়, ততদিন আফিস যাইতেও তেমন গা'গরজ করে না, আফিসে গিয়াও কাজকর্ম্মে একটু আধটু গাফিলী করে, ভাবে, এ গোলামীর দিন তো শেষ হইয়া আসিল, আর কেন?

তারপর, যখন ফল বাহির হয়, এবং সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে নিজের নামটি খুঁজিয়া পায় না—তখন আবার পূর্ণ উদ্যমে কোমর বাঁধিয়া তাহার একমাত্র ভরসা কেরানীগিরিতে সবেগে লাগিয়া পড়ে। ক্রমশঃ স্মরণ হয়, দুইটি অবিবাহিত ভাগিনেয়ী, ঘাড়ের উপর আত্মীয়গণ; রোগে যাহাদের অর্থাভাবে চিকিৎসা হয় না, যাহাদিগকে এত ভালবাসা সত্ত্বেও একটি ভাল জিনিষ বা একখানা ভাল কাপড় জামা দেওয়া ঘটে না, যাহাদের ঐহিক কোনও কামনাই মিটাইতে পারে নাই, যাহাদের জন্য তাহার এই চিরজীবনব্যাপী এত কষ্টকর দাসত্ব—যাহার বিনিময়ে মাত্র এই আশী টাকা! সমুদ্রে শিশিরবিন্দু, এ কিছুই নয়—তবু—তবু এই বা আসে কোথা হইতে? এই বা কম কি? এতে কি অল্প সাহায্য হয়? ঘরে আছে কি? সাধ্যই বা তাহার কি? এই ৮০৲ টাকার চেয়ে বেশী পাইলে খুবই ভাল হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এ ৮০ টাকাও যদি না পাওয়া যায়? না পাইলে কি হয়, অভয় তাহা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠে।

কাজেই এ চাকরিটি তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে; এ গেলে কোন মতেই চলিবে না। তাহা হইলে সপরিবারে সে অনাহারে শুকাইয়া মরিয়া যাইবে! তাই, প্রাণপণ শক্তিতে অভয় পুনরায় কার্য্যে মন দেয়।

প্রত্যহ ভোর ছয়টায় শয্যা ত্যাগ করিয়া, খালি পেটে এক পেয়ালা গরম চা ও গোটা চারেক বিলাসপুরী বিড়ি টানিয়া, তাড়াতাড়ি মাথায় ও গায়ে একটু তৈল লাগাইয়া, ততোধিক তাড়াতাড়ি মাথায় ঘটি কয়েক জল ঢালিয়া, সুচারুরূপে চুল আঁচড়াইয়া, স্যাঁৎসেতে প্রায়ান্ধকার রান্নাঘরে উপুড় হইয়া বসিয়া গোগ্রাসে অর্দ্ধসিদ্ধ অতিগরম দু'টি ভাত মুখে দিয়া, সনাতন শার্টের উপর ধুতি, কোট ও পাট করা চাদরখানি ঝুলাইয়া, পকেটে পানের ও বিড়ির ডিবা দুইটি ফেলিতে ফেলিতে আটটায় গৃহত্যাগ করিয়া উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ষ্টেশনে আসিয়া ৮-৫৭র গাড়ী ধরে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ীতে সেই বিভিন্ন আফিসের চিরপরিচিত মুখ, সেই সব বন্ধুগণের সহিত আফিসের কথা, সাহেবদের কথা, সাংসারিক সুখদুঃখের কথা কহিতে কহিতে, হাওড়ায় পৌঁছায় আর গাড়ী হইতে নামিয়াই মরণ-বাঁচন-জ্ঞান-শূন্য হইয়া আফিস অভিমুখে দৌড়ায়।

আফিসেও সেই চিরন্তন লেজার, টাইপরাইটার, যোগ-বিয়োগের অঙ্ক, ফাইল, কাগজ, চাপরাশি, বাবু, সাহেব। দিবসে দুই চারিবার হয় ফুটপাথে দাঁড়াইয়া, নয় কোনও গুদাম ঘরে গিয়া এক আধ ছিলিম তামাক, ২।৪টা পান ও ২।১ গেলাস দোকানের পাতা-সিদ্ধ চা-পান!

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ছুটি। ষ্টেশনের পথে, রাস্তার বাজার হইতে কিছু তরকারী, সামান্য মাছ, রুগ্ন ছেলের জন্য বার্লি, কোলের মেয়েটার জন্য শটি, আঁইড়ে ছেলেটার জন্য হর্লিক কি য়্যাবারুট, বড়ছেলের প্রাতরাশের জন্য মিছরি, মাতার জন্য বাতাসা ও কলা, এক ভাগিনেয়ীর জন্য সিরাপ বাকস, পত্নীর জন্য জর্দা ও সংসারের জন্য পান প্রভৃতি কিনিয়া

এক রকম রোজই একটা ছোট পুঁটুলি করিয়া বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া ঘামে ও ধুলায় কর্দ্দমাক্ত হইয়া মলিন মুখে গাড়ী ধরে; গাড়ীতে পুনরায় আফিসের কথা ও ২।১টি বিড়ি সেবন ও ঘন ঘন হাই তুলিতে তুলিতে আবার গ্রামের ষ্টেশনে প্রত্যাগমন। ক্ষুধায় পিপাসায় অস্থির, ক্লান্তদেহে কোনও প্রকারে বাড়ী পৌঁছিয়া, হাত মুখ ধুইয়াই আহার। আহারান্তে রাত্রি ৯টার মধ্যেই শয়ন, কারণ পরদিন ছয়টায় উঠিতে হইবে, মেয়েদিগকে উঠিতে হইবে রাত্রি চারিটায় না হইলে ৭-৪৫ মিনিটে আফিসের ভাত দিতে পারিবে না; তারপরই গভীর নিদ্রা!

আজ ১৭।১৮ বৎসর ধরিয়া অভয়চরণ সুনিয়ন্ত্রিত ঘড়ির কাঁটার তালে, ডেলি প্যাসেঞ্জারী করিতেছে; ষড় ঋতুতে সমান, শরীরের ভাল মন্দতেও নির্ব্বিকার, পৃথিবীর গতিবিধিতেও উদাসীন। গৃহে সময়াভাব, আফিসে সুযোগাভাব, কাজেই দৈনন্দিন গাড়ীতে বসিয়াই জোরে জোরে কেহ বাংলা দৈনিক কাগজ পড়ে, কেহ কেহ কখনও কখনও ইংরাজী কাগজও পড়ে, অন্য সকলে তাহা শুনিয়া সংবাদ সংগ্রহ করে আর রাজনীতিচর্চ্চা করে, সামাজিক দোষগুণের বিচার করে কিম্বা সৎ অসৎ সাহিত্যের তর্ক উঠায়; কেহ কেহ সেই স্বল্প সময়টুকুতেই উপন্যাস পড়ে, কেহ তাস খেলে, কেহ বা এই অবসরে বহুদিনের অভ্যাস দিবানিদ্রাটুকুও সারিয়া লয়। ডেলি প্যাসেঞ্জারদিগের গাড়ীর কামরাও প্রায় নির্দ্দিষ্ট, তাই তাহারা চিরপরিচিত একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিবারের মত এক একটি কামরায় চিরকাল চড়িয়া যাতায়াত করে, কেহ কোনও দিন না আসিলে, তাহার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করে।

অভয়ের বয়স হইয়াছিল ৪২।৪৩, অনেক দিনের সীনিয়ার ডেলি

প্যাসেঞ্জার, মোটা মাইনে পায়, অনেক বড় বড় বিষয়ে কথা কয়, স্বদেশী আমলে দেশের অনেক কাজ করিয়াছে; সকলেই বলে অভয়ের ইংরাজীতে বেশ দখল আছে, এইজন্য গাড়ীতে বসিয়া নিত্যই তাহাকে বহুলোকের কৈফিয়ৎ লিখিয়া দিতে হয়; এতদ্ব্যতীত পথে, ষ্টেশনে এমন কি আফিসেও কেহ কোনরূপ বিপন্ন হইলে, অভয় অযাচিত ভাবে তাহাকে উদ্ধার করিতে ছুটে; এ সময় সে কাহারও কথা শোনে না, নিজের ভাল মন্দও ভাবিয়া দেখে না। এই রকম নানা কারণে সকলেই তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত, ছোক্‌রা ডেলি প্যাসেঞ্জারেরা রীতিমত সমীহ করিত।

অভয় শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কালো কোটের উপর ময়লা কম্ফর্টার বাঁধিয়া কাণ দুইটি ঢাকিয়া, একখানা ছাই-রঙের লাহোরী আলোয়ান মুড়ি দিয়া, সেদিন গাড়ীতে ঢুকিবামাত্রই গাড়ীস্থ সকলেই—তাহাকে দাদা, খুড়ো, মামা, ভায়া, দা', বেয়াই প্রভৃতি সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, আগামী পরশ্ব হরতালের দিন কি করা যায়?

অভয়চরণ উপবেশন করিতে করিতে বিজ্ঞভাবে কহিল—"এ একটা ভাবনার কথা বটে। অফিস চাও, না হরতাল চাও?"

প্রৌঢ় আনন্দ আইচ্ কহিল—"হরতাল করবে স্বদেশীওয়ালারা, তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?"

ক্ষুদিরাম বেজ ঝাঁজের সহিত কহিল—"তোমার তো আচ্ছা বুদ্ধি মামা? এ সব যে হচ্ছে আমাদের ভালোর জন্যেই তো! তখন আমাদের এতে যোগ না দিলে কি ভাল দেখায়?"

ঋতুরাজ শিক্‌দার গর্জ্জিয়া উঠিল—"হরতালে আমাদের ভালো কোন্‌খানটায়, খুড়ো দা'ও তো দেখি বুঝিয়ে—"

ক্ষুদিরাম কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে থাব্ড়া মারিয়া চুপ করাইয়া, এক্‌টানে সরাইয়া দিয়া একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া গয়ারাম ঢোল সচীৎকারে কহিল—"এই যে দেশে এত সব উন্নতি হয়েচে, আরও হচ্ছে, এ সব তো এই স্বদেশীওয়ালারাই করেচে। এই যে সাহেবরা আজকাল পথে ঘাটে আমাদিগকে আর অপমান কর্‌তে সাহস করে না, আফিসেও তেমন গালাগাল মন্দ করতে সাহস করে না—এ সব কি অমনি হয়েচে ? এই স্বদেশীর জন্যেই ত' এ সব হয়েচে। আর তুমি বল কিনা, আমাদের ভালো কোন্‌খানটায় ? আচ্ছা বোকৃচন্দর তো তুমি, বেই ?"

ঋতুরাজ নির্ব্বাক্, অন্য সকলে সম্মতিসূচক নীরবতা অবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিল।

ছোক্‌রা ষড়ানন লাহা ধীরে ধীরে কহিল—"ঠিক ঐ জন্যে যে হরতাল হচ্ছে, তা নয়। বিলেত থেকে সাইমন্ কমিশন আস্‌চে কি না, তাই হরতাল করে তাকে অপমান করা উদ্দেশ্য ! মোট কথা, ইংরেজদের যা'তে অপমান হয়, আমাদের এখন তাই করা উচিত।"

অভয় এতক্ষণে কথা কহিল ; কহিল—"তা'হলে বাপু, তুমি ইংরেজের চাক্‌রী কর্‌চ কেন ? ছেড়ে দাওনা কেন ?"

কথাটা সকলেরই সমীচীন ঠেকিল, সকলেই বিকট চীৎকার করিয়া অভয়চরণকে সমর্থন করিল। ষড়ানন বোকা বনিয়া গিয়া আর মুখ খুলিতেই সাহস করিল না।

ধনপতি সার্‌খেল নব্য যুবক , বি-এ ফেল করিয়া অল্প দিন হইল রেলিব্রাদার্সের আফিসে ৩০ টাকা বেতনে ঢুকিয়াছে ; কহিল—

"বাস্তবিকই যদি সবাই আমরা এক জোটে কিছুদিনের জন্য ইংরেজ কেন সমস্ত বিদেশীদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ কাটিয়ে নিজের নিজের ঘরে এসে বসি, তা'হলে দেখবেন, সেইদিনই আমাদের স্বরাজ-লাভ—"

অভয় বাধা দিয়া কহিল—"স্বরাজ-লাভ নয়, বাবা, সপরিবারে স্বর্গ লাভ!—" আবার তেমনি সহাস্য বিকট চীৎকারে অভয়ের কথার অনুমোদন ঘোষিত হইল।

অভয় বলিয়া চলিল—"বাপু হে, তোমরা ছেলেমানুষ! স্বরাজ স্বরাজ কর যে—স্বরাজ পেলে কি অবস্থাটা দেশের হবে একবার ভেবে দেখচ কি? এই তোমাতে আমাতে প্রথম দফায় মারামারি কাটাকাটি হবে; তারপর হিন্দু মুসলমানে, তারপর বাঙালী মেড়োয়; তারপর, স্বরাজ পেতে যদি ১৫ দিনও ঘরে বসে থাক'—তবে খাবে কি? বল'—উত্তর দাও! কার ঘরের এমন অবস্থা যে, বিনা রোজগারে ১৫ দিন বসে' খেতে পারে? বাবাজী, এখনও তোমার মাথার ওপর তোমার বাপ আর বড় ভাই রয়েচেন্ কিনা, তাই এখনও টের পাওনি যে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গেরস্ত ঘরের ভেতরকার কি অবস্থা।"

সকলেই "ঠিক ঠিক" বলিতে বলিতে ছাতা চাদর ঠিক করিতে ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, গাড়ী লিলুয়া ছাড়িল।

হরতালের বিপক্ষদলের বিজয়গর্ব্ব ও স্বপক্ষদলের অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনিতে ট্রেণ আসিয়া হাওড়া প্লাটফরমে থামিবামাত্রই, সকলে গাড়ী হইতে হুড়াহুড়ি করিয়া নামিয়া পড়িয়া প্লাটফরমস্থ ঘড়ির পানে চাহিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিল—গাড়ী সাড়ে তিন মিনিট লেট! আর তখন হরতালের কথা কাহারও মনে রহিল না, সকলে ঠেলাঠেলি করিয়া নির্গমন-পথের দিকে

ছুটিল। ব্যস্ততায় কাহারও কাছা খুলিয়া লুটাইতে লাগিল, কাহারও চাদরখানা পড়িয়া গেল, কাহারও ছাতাটা হাত হইতে ছটকাইয়া পড়িল, কেহবা পা পিছলাইয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল, কেহ বা জুতার ফিতা বাঁধিতে ভুলিয়া যাওয়ায় পদে পদে হোঁচট খাইতে লাগিল, মৃতাশৌচ হেতু খালি পায়ে চলিতে চলিতে কাহারও পায়ে ভীড়ের মধ্যে জুতার চাপে রক্ত পড়িতে লাগিল, কেহ নীচু হইয়া বিলম্বিত কোঁচাটি সামলাইতে গিয়া পশ্চাদ্দিকের ঠেলায় হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া গিয়া অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিতে করিতে উঠিয়াই আবার ছুটিল। অভয়চরণও ইহাদের মধ্যে চলিল।

প্লাটফরমের ফটকটি যথাসাধ্য সংকীর্ণ এবং দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটের মত স্বল্পমুখ করিয়া, বিচিত্র উর্দ্দি-পরা টিকেট-কলেক্টার বাবুটি কর্ত্তব্যপালনের ছলে, এতগুলি ভদ্রসন্তানকে অকারণ আটকাইয়া তাহাদের বিলম্ব ঘটাইয়া দিতেছে, আর পশ্চাদ্দিকের অদৃষ্ট ছোক্‌রা-বাবুদের শ্লেষগুলি নির্ব্বিকারে পরিপাক করিতেছে। পিপীলিকার শ্রেণীর মত ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল ফটক পার হইয়াই ছুটিতে লাগিল।

অভয়চরণও ছুটিল। চলন্ত বাসের সম্মুখ দিয়া, মাল বোঝাই লরীর চাকা ঘেষিয়া, ট্যাক্সির নিকট দিয়া, গরুর গাড়ীর সারির মধ্য দিয়া, রিক্‌শা চাপা পড়িতে পড়িতে, ট্রামের পাশ কাটিয়া, আবালবৃদ্ধ কেরাণীগণ চলিয়াছে। সাত মিনিট দেরী হইয়াছে, আর মরণ-বাঁচন জ্ঞান নাই—কি করিয়া যথাসময়ে আফিসে পৌঁছিয়া হাজিরা খাতায় নাম সহি করিবে।

অভয় আফিসে গিয়াই দেখিল, নোটিশ বাহির হইয়াছে যে, ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে কামাই করিবে, তাহাকে পদচ্যুত করা হইবে—

তাহার কোনও কৈফিয়ৎ শোনা যাইবে না ; নীচে বড় সাহেবের বড় বড় অক্ষরে বড় অস্পষ্ট সই। প্রত্যেক বাবুকে উক্ত নোটিশখানি পড়িয়া স্বাক্ষর করিতে হইবে। অভয় দেখিল, সকলেই সহি করিয়াছে—সে-ও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দস্তখৎ করিল।

সন্ধ্যায় ফিরতি পথে গাড়ীতে বসিয়া সকলেই নিজ নিজ আফিসের হরতালসম্বন্ধীয় হুকুমসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। দুই চারিজন ছোকরা বলিল যে, তাহারা কিছুতেই আফিস যাইবে না, তাহাতে চাকরী থাকুক বা যাক্।

ক্ষুদিরাম রেজ ও ষড়ানন লাহা কাল তাহারা উভয়েই হরতালে যোগ দিবে, কোনমতে আফিস যাইবে না।

অভয় বলিল, তাহার হরতাল করিলে চলিবে না—সে আফিস আসিবেই।

আনন্দ আইচ, ঋতুরাজ শিক্‌দার, ভজহরি মতিলাল প্রভৃতি অধিকাংশ লোকেই অভয়ের মত সমর্থন করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে টুকটাক্ করিয়া নামিয়া পড়িতে লাগিল। এ বেলায় মোটের উপর আলোচনাটা তেমন জমিল না, কারণ একটা দ্বিধা, সঙ্কোচ ও ভয় সকলের মনকেই অনিশ্চিত কর্ত্তব্যের চিন্তায় বিশেষ ভারাতুর করিয়া রাখিয়াছিল।

হরতালের পাণ্ডাগণ অভয়কে আফিস না যাইতে অনেক অনুরোধ ও মিনতি জানাইল, তর্ক করিল, স্বদেশের হিতসাধনকল্পে বহু ত্যাগীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল, মিশরবাসীদের মিল্‌নার কমিশন বয়কটের সুদৃষ্টান্ত দেখাইল, শেষে স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বেচ্ছাচারের ভয় পর্য্যন্ত দর্শাইল —তবু অভয় দমিল না ; সে সরল সোজা ভাষায় জানাইল যে, আফিস

না গেলে তাহার চাকরী থাকিবে না, এবং চাকরী না থাকিলে সে-ও থাকিবে না—সে সপরিবারে অনাহারে মরিবে। তাহারা যদি চিরকালের মত অভয়ের অন্নবস্ত্রের ভার লয় কিম্বা বহু স্বরাজ-ফণ্ডের কোন একটা ফণ্ড হইতে তাহাকে মাসিক এক শত টাকা মাসোহারা করিয়া দিতে অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে সে হরতাল করিয়া শুধু সেদিন কেন জীবনে আর কোন দিনই কোনও আফিসেই যাইবে না। যেহেতু অভয় সাময়িক উত্তেজনার বশে নিজের মন্দ নিজে করিতে রাজী হইল না, পাণ্ডারা মুখের উপর তাহাকে কুলাঙ্গার দেশদ্রোহী প্রভৃতি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। অভয় শুধু হাসিল মাত্র, কোনও উচ্চবাচ্য করিল না।

রাত্রি প্রভাতেই হরতালের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। রাস্তার দুই পাশে লোকারণ্য—হরতালকারীরা মজা দেখিতেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঘাঁটি আগলাইয়া মূর্ত্তিমান স্বেচ্ছাচারের মত স্বেচ্ছাসেবকগণ আফিসযাত্রী বাবুদিগকে বিদ্রূপ ও কটূক্তি করিতেছে, কেহ কেহ আসিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টাও করিতে লাগিল। অভয় কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যথাসময়ে ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং ঠিক সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া নামিল।

ফটক পার হইয়া সকলেই বরাবর যেমন নিজ নিজ আফিস অভিমুখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটে, আজিও তেমনি ছুটিল—অভয়ও ছুটিল।

প্লাটফরমের বাহিরে যেখানে প্রতিদিন ২০।৩০ খানি ট্যাক্সি ও অগণ্য রিক্‌শা থাকে, অভয় দেখিল আজ সেখানে মাত্র একখানি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া, রিক্‌শা একখানিও নাই।

অভয়চরণ আজ চারিদিকে চাহিয়া চলিয়াছে, উদ্দেশ্য, হরতাল কিরূপ

সফল হইয়াছে, তাহা দেখা। হঠাৎ সেই ট্যাক্সি-চালকের সহিত ৫।৭ জন স্বেচ্ছাসেবককে বচসা করিতে দেখিয়া এবং তাহাদের পাশে ছোট ছোট তিনটি স্যুটকেস সমেত একজন ইয়ুরোপীয় মহিলাকে সকলের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে বকাবকি করিতে দেখিয়া, অভয়চরণ ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া সেখানে গিয়া দাড়াইবামাত্রই "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে সেই স্থানটি প্রকম্পিত করিয়া, একজন স্বেচ্ছাসেবককে লইয়া ট্যাক্সিখানা হুস্-হুস্ শব্দে ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া গেল। মহিলাটি করুণ মুখে অথচ উত্তেজিতভাবে সেইখানে দাড়াইয়া রহিল। ট্যাক্সি চলিয়া যাইতেই অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণও "বন্দেমাতরম্" শব্দ করিতে করিতে সগর্ব্বে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ইতস্ততঃ চলিয়া গেল।

অভয়চরণ ব্যাপারখানা কি কতকটা অনুধাবন করিতে পারিলেও সঠিক জানিবার জন্য—ভয়ে ভয়ে অথচ সসম্মানে সেই মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি এবং সে কেন এখানে এভাবে একাকী দাড়াইয়া। ইংরাজ-মহিলাটি অভয়ের মুখপানে কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—তাহাতে তাহার কি প্রয়োজন? সে কালা আদমিদের সঙ্গে কথা কহিতে ঘৃণা করে।

অভয়চরণ সতেজে কহিল—"ক্ষমা করবেন মহাশয়া, যে জাতকে আপনি ঘৃণা করেন, তারা কি আপনাকে কখনও পূজা করবে, ভাবেন? আপনি স্ত্রীলোক, আপনি কেন রাজনীতির কাদায় নেমে নিজের পবিত্র পরিস্কার গায়ে কাদা মাখ্‌চেন?—আপনি বলুন আপনার কি সাহায্য দরকার, আমি তা' করতে প্রস্তুত। আপনি কি কোনও গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করচেন?"

· মেমসাহেব একটু থতমত খাইয়া গিয়া সপ্রতিভ ভাবে ডাগর'দুটি চক্ষু মেলিয়া অভয়ের পানে চাহিয়া কহিল—"হাঁ, বাবু, আমি সকাল ৮টা হ'তে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, একখানা কোনও গাড়ী পাচ্ছি না। কোনও কুলিও পাচ্ছিনা যে বাড়ী যাই। হরতালে যে হাওড়া ষ্টেশনে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। একখানা ট্যাক্সি যদি অতি-কষ্টে পাওয়া গেল তো, তাকে এই সব পশু বন্দেমাতরম্‌ওয়ালারা কি যে বল্‌লে বুঝলাম না, সে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে' গেল। এখন আমি যাই কি ক'রে? কতক্ষণ আর এমন দাঁড়িয়ে থাকি?"

অভয়চরণ আফিসের কথা একবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সে যে আফিস চলিয়াছে, অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে, এবং আজ কামাই করিলে চাকরী পর্য্যন্ত খোয়াইবে, বড় সাহেবের হুকুম—কিছুই তখন তাহার মনে ছিল না।

অভয় কহিল—"আসুন, আমি আপনার মোট নিয়ে আপনাকে আপনার বাড়ী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি! রাস্তায় যদি কোনও গাড়ী পাই তো, তাতে আপনাকে চড়িয়ে দেব'—আর যদি না পাই, আপনি কষ্ট করে হেঁটে চলুন—আপনার মোট আমি কাঁধে করে পৌঁছে দিচ্ছি—"

মেম্‌সাহেব বিস্মিত উল্লাসে কহিল—"বাবু, তুমি আমার সঙ্গে তামাসা কর্‌চ না নিশ্চয়ই—?"

অভয়চরণ সসম্মানে কহিল—"না মহাশয়া, অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তামাসা করার ধৃষ্টতা আমার নেই—আপনি কোথায় যাবেন?—"

"শট ষ্ট্রীট—"

"তবে আসুন—"বলিয়াই ভারী ভারী সুটকেস তিনটি দুই বগল-দাবা

করিয়া ও তৃতীয়টি হাতে ঝুলাইয়া অভয়চরণ আগে আগে চলিল, পিছু পিছু মেমসাহেব চলিতে চলিতে ভাবিল, এতো বড় অদ্ভুত লোক। সন্দেহও একটু করিল, কোনও বদ্‌মাইস্‌ হরতাল-ওয়ালা নয় তো? কোনও বিপদে ফেলিবে না তো! পরক্ষণেই মনকে প্রবোধ দিল, না, তাহা অসম্ভব! চেহারায় কথায় বার্ত্তায় এবং তেজোগর্ভ শুদ্ধ ইংরাজী ভাষা জ্ঞানে ইহাকে গুণ্ডা বলিয়া তো মনে হয় না! তাহাতে এখন বেলা দশটা—

শারীরিক শ্রমে অনভ্যস্ত, অভয় প্রথম ঝোঁকের মাথায় পুল পার হইয়া ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্‌ পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বোঝাগুলি আনিয়া, একবার নামাইয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্য দাঁড়াইল, মেমসাহেবও অভয়ের পাশে দাঁড়াইয়া সশ্রদ্ধনয়নে অভয়ের ঘর্ম্মাক্ত মুখপানে বারম্বার চাহিতে লাগিল।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, সর্ব্বাঙ্গে "কংগ্রেস" লেবেল্‌-আঁটা একখানা মোটরে ৪।৫ জন নেতা উত্তর ষ্ট্র্যাণ্ড রোড হইতে আসিয়া হ্যারিসন্‌ রোড্‌ দিয়া বড়বাজারে প্রবেশ করিতেছে। নেতারা হরতাল ও স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঘুরিতেছেন।

অভয় দৌড়িয়া গাড়ীখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সংযত অথচ দৃঢ় স্বরে পরিস্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল—"মশায়গণ, আপনারা এই যে হরতাল করিয়েছেন, একি ব্যক্তিকে অপমান অসম্মান কর্‌তে, না একটা বিশেষ কোনও রাজনৈতিক কাজে অনাস্থা প্রকাশ কর্‌তে?"

গাড়ীর মধ্য হইতে একজন নেতা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"তার মানে?"

অভয়চরণ তখন এই ইংরাজ-মহিলাটির বিপত্তির কথা যাহা জানিত, সব বিবৃত করিয়া, কহিল—"এখন আপনারা দয়া করে নেমে, ওঁকে ওঁর বাড়ীতে আগে পৌঁছিয়ে দিয়ে, তারপর সহরের শোভা সন্দর্শন করুন—এই আমার আপনাদের কাছে নিবেদন। নিরপরাধ একজন স্ত্রীলোক—বিশেষ করে বিপক্ষ দলের একজন স্ত্রীলোককে—লাঞ্ছিত করে, জাতির জন্যে এ দুরপনেয় দুর্ণামটা আর কিন্‌বেন না। এতে পাপ হয়, আর এই রকম সব অবিবেচক নেতাদের পাপেই, দেশের এমন অকল্যাণ হচ্ছে। আপনাদিগকে করযোড়ে ভিক্ষা কর্‌চি—আমার কথাটি শুনুন; আপনাদের চেয়ে দেশভক্তি আমারও কম নেই—"

নেতারা হাসিয়াই অস্থির। লোকটা পাগল নাকি? একজন নেতা কহিলেন—"আমরা একহপ্তা হ'তে কাগজে নোটীশ দিইচি যে, আজ ৪॥০টার আগে কেউ কোনও ট্রেণে যেন যাতায়াত না করেন, কারণ ষ্টেশনে কোনও গাড়ী বা কুলি পাওয়া যাবে না। তা' সত্ত্বেও যিনি কর্‌বেন তিনি ভুগ্‌বেন, সে জন্যে আমরা দায়ী নই। আর যে ট্যাক্সিওয়ালা কংগ্রেসের হুকুম না মেনে ষ্টেশনে গিয়েছিল, তাকে ফিরিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা ঠিক কাজই করেচে। একজনের জন্যে কোনও নিয়ম তো ভাঙা যায় না? এখন সরুন্ সম্মুখ হ'তে, আমরা যাই, আমাদের অনেক কাজ—"

অভয় জিজ্ঞাসা করিল—"একজন অসহায়া স্ত্রীলোকের জন্যও আপনাদের কোনও কর্ত্তব্য নেই?"

গাড়ীস্থ নেতা ক্রুদ্ধ হইয়া রূঢ়ভাবে কহিলেন—"কেহে বাপু,

তুমি আমাদিগকে কর্ত্তব্য শেখাতে এসেচ ? এমনি যদি তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান, দাওগে না তুমি ঘাড়ে করে মেম্‌সাহেবের মোট বয়ে'—তোমার পরকাল উদ্ধার হয়ে যাবে।"

অভয় উত্তেজিত হইয়া কহিল—"তোমরা আজ থেকে যেন মহাত্মা গান্ধীর নাম বা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম উচ্চারণ ক'রে, এ দু'টি মহাপুরুষের আর অপমান করো না ! এই তোমাদের অহিংসানীতি ? এই স্বরাজের পত্তন ? ধিক্—ধিক্—"

অভয় চলিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার মোট লইয়া চলিতে লাগিল। মোটরে নেতাগণ পাগলের পাগলামী দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বড়বাজারে ঢুকিল ; রাস্তার লোকগুলি অভয়ের ও মেমসাহেবের অনুসরণ করিতে লাগিল।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাছাকাছি আসিয়া মেম্ সাহেব বলিল—"বাবু, এই ক্লাইভ ষ্ট্রীটেই চল ; আমার বাড়ী পর্য্যন্ত তুমি যেতে পার্‌বে না—হগ্-পিগ্ কোম্পানির আফিস চেন ?—"

অভয় বলিল—"চিনি—"

হগ্-পিগ্ কোম্পানির ফটকে মাল নামাইয়া দিয়া, অভয় কহিল—"এইবার আপনি চাপরাসিদের দিয়ে উপরে নিয়ে যান, আমি চল্লুম—"

অভয় ফুটপাথে নামিতেই মেম্‌সাহেব, অভয়কে ফিরাইয়া সকৃতজ্ঞ অন্তরে ও প্রশংসমান ভাষায় তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া তাহার নাম ও ঠিকানাটি চাহিল।

অভয় বহু আপত্তি করিল, কিন্তু মেম্‌সাহেব শুনিল না—আদায় করিয়া লইয়া তবে ছাড়িল। অভয় ডাক্কিমিউল আফিসেরই ঠিকানা দিয়া

বিদায় হইল। মহিলাটির কোনও পরিচয় সে চাহিলও না, পাইলও না।

*　　　　*　　　　*

তখন দুইটা বাজে। আফিসের পথে পা দিয়া অভয়ের অন্তরাত্মা ক্রমে হিম হইয়া আসিতে লাগিল। যতই আফিসের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যদিও বড় সাহেবকে সে বিলক্ষণই চেনে, তবুও চলিল—যদি কোনও রকমে চাকরীটি ফিরিয়া পায়। এতকালের চাকরী, একমাত্র আশ্রয়—তাহাও গেল? কি দুর্ব্বুদ্ধিই না তাহাকে ধরিয়াছিল! নৈরাশ্যে তাহার হৃদ্‌স্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল! তবু আশা—

আফিসের ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্রই দেখিল বহুপূর্ব্বেই নোটিশ ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে—তাহাকে একজন দারোয়ানকে ও অন্য দুইজন কেরানীকে একদম ডিসমিস্।

অভয় দারোয়ানের টুলে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, দারোয়ান প্রবোধ দিল, এক ঘটি জল পান করাইল, মাথায় একটু বাতাস করিল। অভয় অনেকটা সুস্থ হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একবার বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ত্রিতলে উঠিল। বড় সাহেব দেখা তো করিলেনই না, উপরন্তু তাহাকে ঢুকিতে দিয়াছে বলিয়া দারোয়ানের পর্য্যন্ত কৈফিয়ৎ তলব হইল।

অভয় যেন শ্মশান হইতে বাটী ফিরিল। গৃহের সকলে প্রমাদ গণিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। শোকে দুঃখে এবং নৈরাশ্যে সে রাত্রি আর এবাড়ীতে হাঁড়ি চড়িল না।

পরদিন প্রত্যুষে অভয় এক অপরিচিত কণ্ঠস্বরে দুয়ার খুলিয়া দেখিল, বড় সাহেবের জনৈক বেয়ারা একখানি পত্র হস্তে তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছে।

বেয়ারা দীর্ঘ এক সেলাম ঠুকিয়া, পত্রখানি অভয়কে দিয়া, মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল—"বড়া বাবু, বান্দা এ খুশ্ খব্রি লায়া—"

সাহেব লিখিয়াছে, অভয় এই মাস হইতে দুই শত টাকা বেতনে বড়বাবু নিযুক্ত হইয়াছে, সে যেন যথাসময়ে আফিসে আসে।

অভয়ের হাত কাঁপিতে লাগিল, চক্ষের উপর পৃথিবীটা নাচিতে লাগিল; তাহার গত দিনের ঘটনাগুলি একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি বেয়ারা সাহেব?"

মুসলমান বেয়ারা দাড়ি নাড়িয়া কহিল—"কা'ল হগ্‌পিগ্ কোম্পানির বড় সাহেবের মেম, সন্ধ্যে থেকে আমার সাহেবকে আপনার নাম করে' করে' কেবলি কি বল্‌ছিল,—ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না ব্যাপারটা কি। কেন, আপনি কি বুঝ্‌তে পার্‌চেন না?"

অভয়ের নিরানন্দ গৃহে আবার আনন্দ কোলাহল জাগিয়া উঠিল। আগামী অমাবস্যায় গৃহে যে রক্ষাকালী পূজা হইবে, অভয় সব কাজ ফেলিয়া মাতার সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে তাহারই ফর্দ্দ করিতে বসিয়া গেল।

ঝুঁপী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দাদা থাকেন রেঙ্গুনে, বৌদিদি ও ছেলেরা সেইখানেই। বাড়ীতে মা ও আমার এক পিসীমা। দুইজনেই বৃদ্ধা, উভয়েরই বয়স প্রায় ষাঠের কাছাকাছি; কাজেই, বিবাহের তাড়া আমায় এনট্রান্স পাশ করার পর হইতেই সহিয়া আসিতে হইতেছিল, কিন্তু আমি বিবাহ করি নাই। কেন যে করি নাই, তাহার কারণ—আমি মুখে বলিতাম যে পড়ার ব্যাঘাত হইবে, লোকে বলিত এখনও ফুল ফোটে নাই, এবং অন্তর্য্যামী জানিতেন প্রকৃত কারণ।

যাহা হউক, যখন একে একে বি-এ, পাশ করিলাম ও আইনের শেষ পরীক্ষা দিয়া মা সরস্বতীকে ইঙ্গিতে বিদায়বার্ত্তা জানাইলাম, তখন আর আমার আপত্তি করিবার মত কিছুই রহিল না।

বাড়ী আসিয়াছি। মা বলিলেন—"হ্যাঁরে,এইবার বিয়ে কর্‌বি তো? আর তো পড়া নেই—"

পিসীমা তরকারি কুটিতেছিলেন, বঁটিটি কাৎ করিয়া তরকারি কোটা অসমাপ্ত রাখিয়াই ছুটিয়া আসিলেন, বলিলেন—

"জিজ্ঞেসা আবার কি কর্‌চ বৌ? ছেলে কি বলবে যে 'হাঁ বিয়ে করব?' তাতে আবার বলু আমাদের যে মুখ-চোরা। এই অগ্রাণ মাসেই ঠিক করে ফেল' সব।"

কথাটাকে চাপা দিবার জন্য আমি বলিলাম—"সে হবে, সে হবে—দেখ' পিসীমা অনেকদিন ছানার ডাল্‌না খাই নাই; এর মধ্যে একদিন ক'রো তো?"

মা বলিলেন—"আ মরে যাই; এ আর কোন্ পদাত্ত জিনিষ, বাবা? আজই করে দেব। যা' যা' খেতে মন হবে, তা' তক্ষুনি বলিস্।"

পিসীমার মাথায় যখন যাহা ঢুকিবে, কার সাধ্য যে তাহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করে? তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—

"যাদব ঘোষ মাথা কুটে মরচে। আহা, কালও পুকুর-ঘাটে ঘোষগিন্নী আমার হাত ধরে কত সাধাসাধি কর্‌ল। আমি তো এক রকম কথা দিয়েই এসেচি।"

মা স্বল্পভাষিণী, তাঁহাকে কিছু বলিলে তিনি শুনেন; কিন্তু পিসীমা—

মা খাবারের এঁটো রেকাবী ও গেলাসটি লইয়া দাওয়ার নীচে, একটু সান-বাঁধানো জায়গা ছিল বাসন মাজিবার জন্য, সেইখানে রাখিয়া আনন্দ ও কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন।

পিসীমার ভাববন্যা একবার ছুটিলে, কার সাধ্য তাহা রোধ করে? তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হাঁরে বলু, তোর যাদু ঘোষের মেয়ে ঝুঁপীকে মনে আছে?"

আমি কি বলিব? যাদব ঘোষকেই আমি চিনি না, তাঁর মেয়ের কথা তো বহুদূরে। তবে যাদববাবুর নাম জানি, কারণ তিনি গ্রামের জমিদার।

আমার কোনও উত্তর না পাইয়াও পিসীমা দমিলেন না। বলিলেন—"তা' মনে না থাকারই কথা। কতদিন গাঁ-ছাড়া তুই···"

মা বলিয়া উঠিলেন—"আজ আট বছর।"

পিসীমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"বাবাঃ একযুগ। তখন আর ঝুঁপীর বয়স কত? পাঁচ ছ' বছর? কি বল' বৌ—"

মা বলিলেন—"হাঁ, ঐ রকমই হবে।"

বুঝিলাম শ্রীমতী ঝুঁপীর বয়স এক্ষণে তাহা হইলে তের চৌদ্দ বৎসর হইবে। আলোচনাটা নিতান্ত মন্দ লাগিতেছিল না।

পিসীমা কহিয়া চলিলেন—"তবে? এখন যদি একবার দেখিস—? আহা মেয়ে তো নয়, যেন সাক্ষেৎ নক্ষ্মী-ঠাকরুণ। কেমন ননির মত গা, পানের মত মুখ, এতটুকু কপাল, কেমন টানা চোখের ভুরু, এক ঝাড় চুল—যেন একটা পুতুল। এখানে যে সে নেই, থাকলে একবার দেখাতাম তোকে—যার নাম মেয়ে। যেমন ধীর স্বভাব, তেমনি শান্ত। সাত চড়ে মুখে রা' নেই। অত বড় জমিদারের মেয়ে, কত নেকাপড়া জানে, অথচ এতটুকু চল্লা-বল্লা নেই! এমন মেয়ে নইলে কখনও বৌ মানায়, না ঘর সাজে? কি বল' বৌ?"

মার রুদ্ধ আবেগও ক্রমশঃ মুক্তির পথে আসিতে সুরু করিল। কহিলেন—"তা' আবার বলতে? যাদু ঘোষের তো কত পূজো মানত করে,' ঠাকুর দেবতার দোর-ধরা ঐ একটা মাত্র মেয়ে। শুনেছি, মেয়ের মামারাও না কি খুব বড়লোক। কল্‌কাতায় উকীল।"

আমি এখনও নীরব, কারণ এক্ষেত্রে বক্তব্য আমার কিছুই ছিল না। আমি শ্রোতা মাত্র।

মা ও পিসীমা হয়ত ভাবিলেন যে আমি প্রস্তুত, যেন কেবল দাদার

মতের অপেক্ষাতেই বসিয়া আছি, তাই জানাইলেন—"ছিরামও তো ভাই নিকেচে যে যাদববাবুর মেয়েকে বলরামের যদি পছন্দ হয়, তবে এ বিয়েতে তার বা বৌমায়ের কারও অমত নাই। কেমন না ঠাকুজ্জি?"

শ্রীরাম আমার অগ্রজ।

পিসীমার উৎসাহ তখন দেখে কে? কহিলেন—"তারা তো নিকেচে। আর অপছন্দ হবেই বা কেন? নগদ তিন চার হাজার পর্য্যন্ত দেবে মেয়েকে, কি সব হাল ফেসানের গয়নার নাম মনেও থাকে না বাপু, সোণায় মুড়ে দেবে। তা ছাড়া গাঁয়ে ঘরে কম্ম, জমিদার মানুষ, বারো মাসে তের পর্ব্বে তত্ত্ব-তালাস তো হবেই। যাদু ঘোষের ঐ একটা মেয়ে—ভবিষ্যতে এই জমিদারী সবই তোর হাতে আসবে। চাই কি, তোকে ওকালতী তো করতেই হবে না, ছিরামকে পর্য্যন্ত আর পেটের দায়ে সেই বার নদী তের সমুদ্দুর পারেও পড়ে থাকতে হবে না। এ সম্বন্ধ ছাড়াও যা,' হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলাও তাই। কি বল' বৌ?

মা উত্তর দিলেন—"তা আর বলতে? একশো বার।"

পিসীমা তো কাঁটাল না পাকিতেই ভ্রাতুষ্পুত্র যুগলের গোঁপে তৈল লাগাইয়া দিলেন। রাম না জন্মিতেই রামায়ণ রচনা হইয়া গেল। কিন্তু কাঁটাল পাকাইবার বা রামকে ধরাধামে আনিবার কর্ত্তা যে আমি, আমার কেবল একটু কৌতুক জন্মিল মাত্র, উৎসাহ একটুও জন্মিল না। আমি মনে মনে কেবল একটু হাসিলাম।

মা ও পিসীমা যে জমিদারের কন্যা শ্রীমতী ঝুঁপীর সহিত বিবাহ দিতে এত লালায়িত, তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল।

আমাদের সাংসারিক ও অন্যান্য পরিচয় দিবার মত কিছুই নাই।

বৰ্দ্ধমান জেলায় আমাদের বাড়ী। গ্রামের নাম কুশীপুর, একখানি নাতিবৃহৎ গ্রাম।

আমার বয়স যখন এক বৎসর, তখন আমার পিতা স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ছিলেন বৰ্দ্ধমান জজ আদালতের তৌজি সেরেস্তায় চল্লিশ টাকা বেতনের একজন সামান্য কৰ্ম্মচারী।

বাবার জীবদ্দশাতেই আমাদের সংসারে কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদনটা চলিত, কাজেই তাঁহার মৃত্যুর পর আমাদের দুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌছিয়াছিল।

দাদা আমার চেয়ে দশ বৎসরের বড়। তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াই একটি চাকরী পাইয়া বৰ্ম্মা চলিয়া যান। সেই হইতেই তিনি বর্ম্মা-প্রবাসী, সে আজ বিশ বৎসর হইতে চলিল। এখন দাদার বেতন চারিশত টাকা।

আমিও আজ আট বৎসর কলিকাতায়। দাদাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

এই সকল কারণেই, গরীব মা ও পিসীমা আশু অর্থলোভ ও ভবিষ্যতে জমিদারী লাভের আশাতেই এই ঘটকালীটি যাহাতে অবিলম্বে শুভকার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবতী।

আমার আত্মীয়গণ গরীব বটে, কিন্তু আমি কখনও অর্থকষ্ট পাই নাই; বরং দাদার অর্থ-সাহায্যে ও ভ্রাতৃজায়ার গোপন দানে অভাব অনুভব করা দূরে থাকুক, রীতিমত ধনি-সন্তানের মতই এতদিন বৰ্দ্ধিত হইয়াছি। কাজেই, দুঃস্থ গৃহস্থের আশা আকাঙ্ক্ষাটি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, উল্টা মা ও পিসীমার এবম্বিধ জমিদার-প্রীতি ও অর্থলালসায় হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

পিসীমাদের কথায় একটু মন্দা পড়িয়া আসিয়াছিল, কারণ তাঁহাদের বক্তব্য প্রায় শেষই হইয়া উঠিয়াছিল; আমার হাসিতে প্রসঙ্গটা একটা রূঢ় আঘাত পাইয়া আবার জমিয়া উঠিল।

পিসীমা ও মা বিস্মিত হইয়া আমার পানে চকিত ও করুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। পিসীমা কহিলেন—"হাস্‌চিস্ কিরে? নিজেদের অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখ্ দিকিন্? এই ভাঙ্গা বাড়ী, এ ঘরে জল পড়্‌চে, ও ঘরের মরকোজা উড়্‌চে, পাঁচির পড়ে যাচ্ছে, এ বাড়ীতে মানুষ থাক্‌তে পারে? আমরা দুই রাঁড়ী, অখদ্দে মানুষ, যমে ভুলে আছে বলে' তোমাদের বাড়ী আগ্‌লাচ্ছি বইতো নয়! আর ক'দিন? সতেরো বছরের ছেলে ছিরাম আমার, সেই যে তেপান্তরে গিয়েচে, সে কি সাধে গিয়েচে, বাবা? তোমাকে মোচ্‌মোচ্ টাকা দিয়ে ওকালতী পর্য্যন্ত পড়ালে, একটি দিনের জন্যেও তোমাকে তোমার বাপ-মরা জান্‌তে দেয় নেই—সেই কি সুখে আছে?" উভয়েই অশ্রু মুছিলেন।

ব্যাপার ক্রমশঃ করুণরসে গড়াইয়া পড়িল, আমার মনটাও যেন তাহাতে ডুবিয়া গেল। কিন্তু—বিবাহ? এই পাড়াগেঁয়ে অসভ্য ঝুঁপীর সঙ্গে? এ কখনই করিতে পারিব না। দাদার প্রীতির জন্য, সংসারের উন্নতির জন্য, সব করিতে পারি—কিন্তু এই ঝুঁপীকে বিবাহ আমি কিছুতেই করিব না! যদিও তাহাকে এখনও দেখি নাই, তথাপি আমি তাহার চেহারা শিক্ষা সভ্যতা সমস্তই কল্পনা করিতে পারি!—এ অসম্ভব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় পড়ার সময় আমার সহপাঠী অনেক বন্ধুবান্ধব পল্লীগ্রাম দেখিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিতে চাহিত, কিন্তু নিজ গৃহের অবস্থা আমি কাহারও কাছে ভাঙিতে লজ্জাবোধ করিতাম বলিয়া, চিরকাল তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়াই গ্রামে পলাইয়া আসিতাম।

আমাদের বাড়ীতে মাটীর ছোট দুইখানি মা'ট-কোঠা ঘর, একখানি রান্নাঘর ও একখানি ভাঁড়ার ও পূজার। শেষোক্তখানি দাদা সেবার বাড়ী আসিয়া করাইয়াছিলেন। ঝি চাকর কেহই নাই। খিড়কিতে একটা ডোবা আছে, তাহাতে সরা হয়; ঘোষ-দীঘির জলে স্নান ও তাহাই পান করা হয়। মা ও পিসীমাই সব কাজ করেন। এমন ক্ষেত্রে কি বাহিরের লোককে বাড়ীতে আনা যায়?

অথচ কলিকাতায় যখন থাকিতাম, তখন মনটা এত উঁচু পর্দায় বাঁধা থাকিত যে, এই বলরাম বসু যে কখনও কোনও কালে কুশীপুর গ্রামে বাস করিয়াছিল বা করিবে, তাহা আমি নিজেই অনেক সময় বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

অকুণ্ঠিত অর্থব্যয়ে সর্ব্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য যখন একান্ত করতলগত হয়, মনটা তখন স্বভাবতই কল্পিত মায়া-মৃগের পশ্চাৎ অনুধাবন করে। তরুণ যৌবনের ফেণিলোচ্ছল সুরভিত সুরা যখন তরল রক্তস্রোতে পড়িয়া ধমনীতে ধমনীতে প্রত্যেক শিরা উপশিরায় রক্ত বন্যার সঞ্চার করে, গাঢ় শোণিতকে গাঢ়তর রক্তিমায় জবাকুসুম-সদৃশ আরক্ত করিয়া তোলে,

মনোমালঞ্চকে অকস্মাৎ অকারণ অজস্র পত্রপুষ্প-সম্ভারে পুষ্পিত পীড়িত ও অবনম্র করে, তখন জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য এক সঙ্গে লক্ষ পিকের কুহুর মত, স্বপ্নলোকের কল্পসুষমার মত, সঙ্গীতের মধুময়ী মোহিনীর মত, সমস্ত দেহ-মন ভরিয়া ছাপাইয়া একটি কিশোরী মূর্ত্তিকে ঘিরিয়া জাগিয়া উঠে। এই মূর্ত্তিই তখন একমাত্র আরাধ্য ও বাঞ্ছিত হইয়া সমস্ত প্রাণমনকে তাহারই সেবায় নিযুক্ত করিয়া ফেলে।

এ একটি দশা বিশেষ। আমাকেও বি-এল পরীক্ষার বহু পূর্ব্ব হইতেই উক্ত দশায় পাইয়াছিল।

বঙ্গদেশীয় সকল যুবকদেরই যে এরূপ দশাপ্রাপ্ত হয়, তাহা আমি জানি না, কারণ কোথাও পড়ি নাই, এমন কি আইন শাস্ত্রেও নয়; তবে শতকরা ৯৯ জন বাঙ্গালী ছাত্রই (অবশ্য সে সময়ে যদি সে অবিবাহিত থাকে, তবেই) যে একটি করিয়া মানসী প্রেয়সী মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহাকেই পাইবার জন্য যে ব্যাকুলতা পোষণ করে, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে হলফ করিয়া এফিডেফিট পর্য্যন্ত করিতে পারি। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, উক্ত মূর্ত্তি ঠিক গঠিত নয়, উহা নানাস্থান হইতে তিল তিল করিয়া চয়ন করিয়া অভিনব তিলোত্তমা, সৃষ্টি করিতে হয়। কেমন জান? এই আমার যাহা হইয়াছিল—ইহুদী মেয়ের রং, ইংরেজ মেয়ের তেজ ও সাহস, পার্শী মেয়ের মত সৌখীন, ইতালিয়ন মেয়ের মত গঠন, ফরাসী মেয়ের মত রসিক, ব্রাহ্ম মেয়ের মত কাপড় পরা, উরাঁও মুণ্ডা মেয়ের মত নিটোল স্বাস্থ্য, শ্রীমতী কেবলবালার মত কণ্ঠ, নশীবাবুর মত নৃত্য, শ্রীমতী সুভাগিনীর ভগিনী অভাগিনীর মত অভিনয়-নৈপুণ্য, স্বর্গীয়া অশ্বিনী দাসীর মত কবিপ্রতিভা, বঙ্গবধূর

সেবা স্ত্রী ও প্রাণ, এবং দিদিমার মত পাতিব্রত্য। এই প্রকার অষ্টধাতু বা অষ্টবজ্রই ছিল আমার জীবনের কামনা, ভবিষ্যতের সাধনা ও জাগ্রতের একমাত্র কল্পনা।

অন্যের মানসী-কল্পনার সঠিক ইতিহাস আমি তত অবগত নই, কারণ উক্ত বিষয়ে কখনও কোনও গবেষণা করি নাই। আমি নিজের কথাই বলিতে পারি, এবং তাহাই বলিব, পরচর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করিব না।

আজন্ম পল্লীগ্রামের সংস্কার ও আবেষ্টনের বদ্ধ হাওয়ায় মানুষ হইয়া পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে যখন প্রথম কলিকাতায় আসি তখন রাজধানীর পাকা পথ, বাষ্প বিজলীর আলোক, কলের জল, থিয়েটার, বায়স্কোপ, মোটর আমায় যতটা অভিভূত না করিয়াছিল, ভদ্র মহিলাগণের বেশ বিন্যাস, আচার ব্যবহার, নির্ভীক অথচ শান্ত সলজ্জ অনবগুন্ঠিত মুখ, স্বাধীন গতায়তি, একাকী পথে বাজারে গমনাগমন ও পুরুষদের সঙ্গে ক্লাশে একত্র পড়া তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা আলাপ পরিচয় দেখিয়া, আমার চির-পোষিত ও আজন্ম-দৃষ্ট অভ্যাস ও বিশ্বাসের মাথায় বজ্রাঘাত হইল এবং এই সব ব্যাপারই আমায় ততোধিক স্তম্ভিত করিয়া দিল। আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতাম, কিছু ভাবিতে পর্য্যন্ত পারিতাম না। এরূপ অঘটন কি করিয়া সম্ভব হইল? এ দেশে কি সমাজ নাই, না এরা কোনও নিয়মের বাধ্য নয়? এরা কি বাঙ্গলা দেশের ও সমাজের বাহিরে না কি? এদের একঘরে ধোপা নাপিত বন্ধ করাইতে কি এখানে কোনও সমাজপতি নাই?

ক্রমশঃ রাজধানীর এই নয়নান্ধকারী দৃপ্তোজ্জ্বল সভ্যতা আমার

অন্তরের তলান্তদেশ পর্য্যন্ত মূলবিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। আমি বিস্মিত অথচ প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতাম ও ভাবিতাম যে কোথায় কুশীপুর আর কোথায় এই কলিকাতা! এক নরক, আর এক স্বর্গ!

প্রথমটা আমার এমনই চমক লাগিয়াছিল যে সারাদিনই আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতাম। দেখিয়া যেন আশা আর মিটে না। পাঠে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এবম্বিধ চিন্তাশীলতার দরুণ প্রথম প্রথম পথ চলার সময়ে কতদিন যে মোটর ও ট্রাম চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। লজ্জার কথা, ঈদৃশ ভাব-বাহুল্যের জন্য দুই তিন দিন পথ-চল্‌তি ঘোড়ার গাড়ীর দুই তিনজন কোচম্যান আমাকে "বাঁচাইতে" আমার পৃষ্ঠদেশে দুই এক ঘা' সুকোমল কশাঘাতও যে না চালাইয়াছে তাহাও নয়।

যাহা হউক, এই আবিষ্ট ভাব সামলাইতে আমার বৎসরাধিক কাল লাগিয়াছিল। যখন একটু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিবার শক্তি ফিরিল, তখন দেখিলাম যে, বিলাস আমার দেহে মনে রক্তে মজ্জায় ও বসায় পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমি যে অসভ্য দরিদ্র পল্লীগ্রামবাসী, জ্যেষ্ঠের অনুগ্রহে এত ব্যয়বাহুল্য করিতেছি এবং তিনি যে অতি কষ্টে আমার ব্যয় বহন করিতেছেন, এসব কথা মনেই পড়িত না, বরং চিন্তা করিতেও লজ্জায় মরিয়া যাইতাম।

আমার মনের গতি ফিরিয়া গিয়া, আমি পূরাপূরি সহরে বাবু হইয়া উঠিলাম। এ প্রলোভন জয় করবার শক্তি আমার ছিল না, বরং এমন কোন হিতৈষীও সে সময়ে ছিল না যে, এই মত্ত তুরঙ্গকে শান্ত

করিতে পারে। ফলে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিল। প্রথম বার আই-এ ফেল করিলাম। আজ স্মরণ করিতে চক্ষে জল আসে, বুক ভরিয়া উঠে, সকলেই আমায় তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু দাদা লিখিয়াছিলেন, —"ভাই বলরাম, ফেল হইয়াছ বলিয়া কোন্‌ওরূপ লজ্জা বা দুঃখ করিও না; তাহাতে শরীরের ও পড়ার দুইয়েরই ক্ষতি অনিবার্য্য। এবার তোমাদের পরীক্ষা বড় শক্ত ছিল, তাই হয়ত তুমি অকৃতকার্য্য হইয়াছ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আগামী বার তিনি তোমায় সুফল প্রদান করেন।" ইত্যাদি।

দাদার প্রার্থনা ভগবান মঞ্জুর করিলেন। পর বৎসর আমি আই-এতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করিলাম।

বি-এ পড়িতে লাগিলাম। কেন জানি না, আমার সহিত খুব কম ছেলেই মিশিত। ফলে, আমার বন্ধু জুটিয়াছিল খুব কম। আমার কিন্তু সর্ব্বদা ইচ্ছা হইত যে ঐ সব ফুটফুটে, টেরি-কাটা, চশ্‌মা-পরা, দেশী ধুতি মালকোঁচা-মারা পাঞ্জাবী গায়ে, সিগারেট-খাওয়া, অজাতগুম্ফ তবুও ক্ষৌরিত মুখ, বাচাল ছেলেগুলির সঙ্গে মিশি, বেড়াই, কথা কই ও তাহাদের বাড়ী যাই; কিন্তু আমাকে তাহারাও ডাকিত না, আমিও গায়ে পড়িয়া তাহাদের সখ্য অর্জ্জন করিতে লজ্জাবোধ করিতাম, যদিও তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। এই সব ছেলেদিগকে আমি মনে মনে প্রশংসা করিতাম। কেমন সহজ সরল অবাধ তাহাদের গতিবিধি, কথাবার্ত্তা ও চালচলন! কেমন নির্ভীক। কেমন চলন্ত ট্রামে তাহারা টুক্-টুক্ করিয়া উঠা-নামা করে, দেখিয়া আমার বুক দুড়্-দুড়্ করিয়া উঠিত! পাহাড়াওয়ালা ও

সাহেবদিগকে ভয় করা দূরে থাকুক, তাহাদের গা ঘেসিয়া যায় ও বসে। কেমন ক্লাসের দুয়ারে গিয়া জ্বলন্ত সিগারেটটি পায়ে চাপিয়া নিভাইয়া ক্লাসে গিয়া নির্ভয়ে বসে; কেমন ক্লাসে বসিয়া উপন্যাস পড়ে; কেমন অনর্গল সাহিত্য আলোচনা করে; কেমন অবাধে সহপাঠিদের সহিত "শ"কার ও "ব"কার যোগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইয়া কথা বলে। এসব তো আমার কাছে অতি-বিস্ময়ের জিনিষ ছিলই, আবার যখন শুনিলাম যে আমাদেরই থার্ড ইয়ার ক্লাসের ছাত্র মুগ্ধবোধ ভট্টাচার্য্য কবিতা ও ছোট গল্প লেখে এবং সেই সব মাসিকপত্রে তাহার নামসহ ছাপা হয়, তখন আমাতে আর আমি রহিল না। ভাবিলাম, কলিকাতা বাস্তবিকই রাজধানীর উপযুক্ত।

এই সময়ে আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, অশ্রুবিন্দু মাইতি। ইহারা ব্রাহ্ম, পূর্ব্বে নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়—এখন দেশের বাস উঠাইয়া দিয়া কলিকাতার ভাড়া বাড়ীতে বাস করিতেছে। অশ্রুবিন্দুর পিতা লোহারাম বাবু কলিকাতা হাইকোর্টে ট্রান্‌স্‌লেটার ছিলেন, এখন পেন্সন ভোগী। অশ্রুবিন্দু আমারই সহপাঠী ও সমবয়সী ছিল।

অশ্রুবিন্দুদের বাড়ীতে আমি যাইতাম। কলিকাতাবাসী ভদ্র-পরিবারের সহিত এই আমার প্রথম আলাপ। পরিবারটি খুবই ছোট, কর্ত্তা, গৃহিণী, অশ্রুবিন্দু তাহার দিদি বীণা ও কনিষ্ঠা লীলা। বীণাও আমাদের মত থার্ড ইয়ারে পড়িত, লীলা তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। বীণার বয়স ২০।২১ লীলার ১৪।১৫, উভয়েই অবিবাহিতা।

প্রথম প্রথম দিদি ও লিলির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আমার বড়ই বাধ-বাধ ঠেকিত, কিন্তু কিছু দিনেই আমার সে জড়তা দূর হইয়াছিল।

এই পরিবারের সহিত পরিচিত হইয়া অবধি আর জুতা মোজা, শেমিজ ব্লাউস ও ঘাগড়া করা শাড়ী পরা মেয়েদিগকে নির্লজ্জ ভাবিতে পারিতাম না, ও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বাল্য বিবাহের দোষ আমার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল।

এ না হয় ব্রাহ্মবাড়ী। বীরভূম জেলার কেদার মুখুজ্যের ছেলে ধনঞ্জয় মুখুজ্যের ছেলে মেয়েরাও ঠিক এই ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মেয়েদের মতই পোষাক করিয়া অবিকল তাহাদেরই মত স্কুল-কলেজে যায়, যেদিন দেখিলাম, সেদিন আর আমার আনন্দের ত সীমা রহিলই না, বরং স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে যে যৎ সামান্য একটু সন্দেহ ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়া গেল।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ"—মনুবাক্য। এ তো আমাদের ছিলই—খনা, লীলাবতী গার্গী প্রভৃতি! সুতরাং বর্ত্তমান যুগে যে আমরা মেয়েদের শিক্ষা দিই না, স্বাধীনতা দিই না, বাল্য বিবাহ দিয়া তাহাদের স্বাধীন মত ও নারীত্বকে চিরকালের মত পঙ্গু করিয়া দিই, এই মহাপাপেই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, যেদিন মেয়েরা ঘরে ঘরে এম্ এ, বি এল, পি-এচ্-ডি, পি-আর-এস্, এম্-বি, বি-ঈ প্রভৃতি হইবে সেই দিনই ভারতে দড়্দড়্ করিয়া স্বরাজ নামিয়া আসিবে। একটা স্বরাজ নয়, ঘরে ঘরে স্বরাজ।

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে দেখিলাম যে হিন্দু সমাজ অপেক্ষা ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানেরা অনেক উঁচু ও অগ্রসর। এই দুই সমাজে মেয়েরা কাপড় পরিতে ও বিনা অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইতে যেমন জানে,

লেখাপড়াও তেমনি জানে। যেমন নম্র তেমনি সভ্য, তেমনি সলজ্জ নির্ভীক! আমার মন প্রাণ বলিল, যে যদি সুখে সংসার করিতে চাও, তবে ব্রাহ্ম কিম্বা খ্রীষ্টান হও।

মন যখন এমনি সন্দেহ দোলায় দুলিতেছিল তখন অশ্রুবিন্দুর সাকার পিতা একদিন হঠাৎ সশরীরে নিরাকার পরম পিতার নিকট চলিয়া গেলেন। ইঁহাদের কলিকাতার বাসও উঠিল। বীণা জনৈক মিষ্টার গ্যাপ্টা—একজন বিলাতফেরৎ নিঃ-সন্তান বিপত্নীক অধ্যাপকের সঙ্গে পরিণীতা হইলেন। অশ্রুবিন্দু মা ও লীলাকে লইয়া মীরাটে চলিয়া গেল। সেখানে সে একটি চাকরী জুটাইয়াছিল, অবশ্য মিঃ গ্যাপ্টার মধ্যস্থতায়।

মনটা বড় বিশ্রী হইল। বীণা ও লীলা উভয়কেই না দেখিয়া প্রথমটা বড় শূন্যতা অনুভব করিলাম। তাই ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত আরম্ভ করিলাম। বন্ধুর বিরহ যে ভগবানের নাম শুনিয়া বা আচার্য্যের তত্ত্বকথা শুনিয়া ভুলিব বলিয়া সেখানে যাইতাম, তাহা ঠিক সত্য করিয়া বলা কঠিন। তবে ইচ্ছা ছিল, আর একটি অমনি বন্ধু-পরিবার লাভ করিয়া এই বন্ধুর বিরহটি ভুলিব এইমাত্র। দিনের পর দিন যায় অশ্রুবিন্দুর স্থান অধিকার করিবার মত আমার দ্বিতীয় বন্ধু আর জুটিল না। তবে সুমধুর সুর-সংযোগে মিহি গলায় উর্দ্ধোপবিষ্টা অদৃষ্টা সুন্দরীর বেতালা গানগুলি আমার বড় ভাল লাগিত, কর্ণে মধুবর্ষণ করিত বলিয়া, আমি সমাজে যাতায়াত সহজে ছাড়িলাম না। একটা কুকুরকে জবরদস্তি জলে ডুবাইয়া ধরিলে সে যেমন সজোরে যথাসাধ্য তাহার চতুষ্পদ ও পুচ্ছ আন্দোলন করিয়া তীরে উঠিতে

অতিব্যগ্র হয়, আমার মনটাও এই ভজনালয়ে আসিয়া ঠিক সেইরূপ ছট্‌ফট্‌ করিত। কিন্তু ইহাতে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ছিল; তাহা আমার কাছে আচার্য্য-কথিত—"আনন্দ রূপমমৃতং।"

এমন সময় আমি ডবল অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হইয়া বি-এ পাশ করিলাম। মা লিখিলেন—যাদু ঘোষ বড়ই পীড়াপীড়ি করিতেছে; তাঁহার কন্যা ঝুঁপীকে আমায় বিবাহ করিতেই হইবে।

এমন সুখের দিনে এই খবর? ধেৎ—সন্ন্যাসী হইব!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ করিতে যে আমি অনিচ্ছুক ইহা মোটেই সত্য নয়। তবে মুখে না-বলা বা তদ্রূপ ভাব প্রদর্শন করা, বাঙ্গালী ছেলেদের একটা সনাতন রীতি। কৈ, কেহ বলুন দেখি যে তিনি প্রথমবার জিজ্ঞাসাতেই "হাঁ" বলিয়াছেন? খুব জোর গলায় এবং নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে, যে, বঙ্গীয় অবিবাহিত যুবকবৃন্দের মধ্যে যতই নির্লজ্জতা থাকুক্ না কেন, বিবাহের প্রস্তাবে তাঁহারা লজ্জাকে অতি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য বিবাহের প্রথমেই লজ্জা, পরে আজকাল, লজ্জাকেই লজ্জা পাইয়া দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে।

যাহাই হউক, আমারও প্রাগুক্ত লজ্জা তো ছিলই, বরং সব চেয়ে বড় কথা ছিল বস্তুতান্ত্রিক, কন্যা লইয়া। আমার স্ত্রী যিনি হইবেন, তাহাকে আমার পছন্দসই হওয়া তো চাই? মা ও পিসীমার নির্ব্বাচিত কন্যা যে কিরূপ, তাহা অবশ্য আর কাহাকেও বুঝাইতে বলিতে হইবে না, তাঁহার নামেই তাহা প্রকাশ। সুতরাং ওখানে এবং ঐ কন্যাকে বিবাহ করা অপেক্ষা আমি বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের আসামী হইয়া মন্দালয়ে গিয়া বাস করিতেও প্রস্তুত।

দাদাকে ও বৌদিদিকে লিখিলাম যে, "ল" পাশ না করিয়া আমি বিবাহ করিব না। সরল মহৎ তাঁহাদের মন, তাঁহারা বলিলেন—তথাস্তু।

বাঁচিলাম। ভগবান উদ্যোগী পুরুষের সহায় চিরদিনই হইয়া থাকেন, এই জনশ্রুতি শুধু শুনিয়াই আসিতেছিলাম, এইবার তাহা

আপনার অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম। আইন ক্লাসে নাম লিখাইলাম—ঝুঁপীকে বিবাহ করিতে হইল না, বা তিন আইনের আসামী হইয়া জেলেও যাইতে হইল না!

ভাবিলাম, এই দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই ঝুঁপীর বিবাহ হইয়া যাইবে। এই বিশাল বিরাট নগরী কলিকাতা, একটা রাজধানী বলিয়া কথা, এখানে কি একটী মনোমত পাত্রী খুঁজিয়া লইতে পারিব না? এখনও তো তিন বৎসর সময় আছে। নিশ্চয়ই পারিব। তবে যে এত উপন্যাসে ও গল্পে লেখে, কেমন সব সুন্দর রাজ-যোটক হয়—সে সব কি তবে নিছক্ মিথ্যা কথা? এত সব বড় বড় বহু সম্মানাস্পদ ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখকগণ কি তবে মিথ্যাবাদী? মন বলিল—মিছে কেন হবে? চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?

বাস্তবিক—চেষ্টা তো আমি কিছুই করি নাই! আর মোটে তিন বৎসর মাত্র মেয়াদ, ইহার মধ্যে হেস্ত-নেস্ত একটা কিছু করিতেই হইবে! নচেৎ সেই ঝুঁপী—

চিন্তা করা যায় না। শরীর আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠে।

জুটিল একটি কন্যা বাগবাজারে। যেদিন এই সম্বন্ধ লইয়া আমার সহাধ্যায়ী জয়হরি আমার ঘরের ক্যাওড়া কাঠের তক্তপোষ খানিতে আসিয়া বসিল, সেদিন আমার অন্তরে যে কি মহোৎসব সমারোহ চলিয়াছিল, তাহা কেবল একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। আমি কবি বা লেখক নই যে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিব। মনে হইল—জয়হরি একি শুনাইল? অমর কবি চণ্ডীদাসের পদখণ্ডের সেইদিন আমার প্রকৃত অর্থ বোধ হইল—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ—"

তিন চারিদিন পরে জয়হরি সকালে ক্লাসে বলিল—"আজ দিনটা ভাল, চল' আজই বৈকালে মেয়ে দেখতে।"

মনে হইল তখনি জয়হরিকে জড়াইয়া ধরিয়া নীরস আইনের ক্লাস ভাঙ্গিয়া দিয়া গাহিয়া উঠি—

—"আকুল করিল মোর প্রাণ।"

বেলা তিনটার সময় জয়হরি, গোবর্দ্ধন ও আমি তিন বন্ধুতে "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া পাত্রী দেখিতে রওনা হইলাম। মেয়েটি শুনিলাম জয়হরিরই ভগিনী।

প্রাণে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও পুলক হইল বটে, কিন্তু লজ্জা আসিয়া সব স্ফুর্ত্তির গলা চাপিয়া ধরিতে লাগিল। কল্পনা-প্রবণ আমি, আমার কল্পনাসাগরে জোয়ার জাগিল বটে, কিন্তু একটা অকারণ লজ্জায় যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল।

গোবর্দ্ধন এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। আমায় অনেক উৎসাহ দিল, তবু আমি ঠিক সহজ হইতে পারিলাম না।

এইখানে গোবর্দ্ধনের একটু পরিচয় দরকার। ইনি গত ছয় বৎসর হইতে ওকালতীতে ফেল করিয়া আসিতেছেন। এই নিমিত্ত ইনি এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, উকীল না হইয়া কখনও জীবনে দার-পরিগ্রহ করিবেন না। কাজেই ল' কলেজের প্রশস্ত ভিত্তির মত, গোবর্দ্ধনদাও ল' কলেজের একটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ এবং উক্ত কলেজ

হইতে অভিন্ন। তাঁহার বয়সও তখন প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ। অধ্যয়নে এমন অভিনিবেশ ও অধ্যবসায় আজকাল সচরাচর বড় দেখা যায় না। অবশ্য এখন তিনি আমার একজন অতি নিকট কুটুম্ব বলিয়াই ইহার অধিক আর তাঁহার পরিচয় দিতে আমি অক্ষম।

আইন শিক্ষার্থীদিগের তিনি একজন সাধারণ "দাদা" ছিলেন। মেয়ে দেখা কার্য্যে ইঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র পারদর্শিতা শুনিয়াছিলাম। ছাত্রাবস্থায়, অর্থাৎ বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে যাহারই বিবাহ হইয়াছে, গোবর্দ্ধনদাই তাহার কন্যা পছন্দ করিয়া দিয়াছে। এক কথায়, মেয়ে দেখায় ইহাঁর মত প্রতিভাশালী পুরুষ জগতে আর কেহ ইতিপূর্ব্বে জন্মায় নাই। তবে বাস্তবিকই এটা একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের বিষয় যে, এত ঘটকালী করিয়া অদ্যাপি তিনি অক্ষত দেহে এবং অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে পারিয়াছেন।

যথাবিধি জলযোগাদির পর কন্যা আনীত হইল। বৃদ্ধ পিতা পুত্র জয়হরিকে অছি রাখিয়া কক্ষান্তরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি তো লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারি না! বহু কষ্টে নানা ছলে গৃহপ্রাচীরগাত্রস্থ ছবিগুলি দেখিবার অছিলায় দুই একবার আড় নয়নে আমার ভাবী প্রিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম বটে, কিন্তু সে বড় অস্পষ্ট দেখা হইল। তাহাতে কি আর মন মানে? মেয়েটি আমার ভালই লাগিল বলিয়া দুঃখ হইতে লাগিল—"ভাল করি পেখন না ভেল।"

পর্দ্দার আড়ালে দ্বারপার্শ্বে অন্তঃপুরিকাদের মৃদুশ্বাস, অতর্কিত সিঞ্জন ও অস্ফুট কলরব আমার নয়ন ভরিয়া দেখার সাধকে যেন চোরাবালিতে চাপিয়া ধরিতেছিল!

গোবৰ্দ্ধন কিন্তু একটুকুও লজ্জিত নয়। সে সহজ অবাধ ভাবে প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিল। সব মনে নাই, তবে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর আজও আমার বেশ স্মরণ আছে। গোবৰ্দ্ধনদাদা এখন এ কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন; তবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ তাঁহার শূন্য সিংহাসনের যে সব বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ অধিকারীগণ এখনও এইরূপ পরোপকারে জীবনপণ করিয়া আছেন, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত, কয়েকটি এখানে বিবৃত করিতেছি।

প্রঃ—তোমার নাম কি?

উঃ—শ্রীমতী দেববালা মিত্র।

প্রঃ—কি পড়?

উঃ—ইংলিশ রীডার পার্ট সেকেণ্ড, চাইল্ডস্ গ্রামার, ওয়ার্ড বুক, আখ্যানমঞ্জরী, কপালকুণ্ডলা, পাটীগণিত—

প্রঃ—আচ্ছা, তোমার বাবাকে একখানা চিঠি লেখ' দেখি? যেন বিদেশ হ'তে লিখচ। মায় ঠিকানা সুদ্ধ। ঠিকানাটা অবশ্য ইংরাজীতে।

মেয়েটি তাহাই করিল। গোবৰ্দ্ধন হস্তলিপি ও রচনারীতি পরীক্ষা করিয়া কাগজখানা আমার কোলে ফেলিয়া দিল।

প্রঃ—আচ্ছা ধর, পয়সায় যদি দেড়টা কলা হয়, তবে চব্বিশটা কলার দাম কত?

উঃ—চারি আনা।

প্রঃ—কি কি রাঁধতে পার?

উঃ—ডাল্না, শুক্তো, মাছের ঝোল, ঝাল, কালিয়া, ভাজা, অম্বল, চপ্, পোলাও, ডাল, ভাত—

প্রঃ—আচ্ছা, সব আগে কি রাঁধতে হয়?

উঃ—অম্বল।

প্রঃ—আচ্ছা ধর, ভাতের ফেন গালিবার সময় তোমার পায়ে যদি দৈবাৎ, গরম ফেন পড়ে যায়, তা' হ'লে তুমি কি করবে?

উঃ—কেরোসিন তেল বা নারিকেল তেলে আর চুণে মিশিয়ে সেইখানে লাগিয়ে দেব।

প্রঃ—আচ্ছা, তুমি শেলাই জান?

উঃ—জানি।

প্রঃ—কি কি শেলাই করতে পার?

উঃ—সেমিজ, পাঞ্জাবী, ছেলেদের জামা, নিকার-বোকার; বালিশের ওয়াড়—

প্রঃ—উলের কাজ কি কি জান?

উঃ—খুঞ্চেপোষ, আসন, মোজা, কম্ফর্টার—

প্রঃ—Embroidery ইয়ে—ইয়ে—

উঃ—হাঁ লেস্‌ও বুনতে পারি।

প্রঃ—গাইতে পার শুনেচি—একটা গান গেয়ে শোনাও।

তখনি একটা বক্স হার্ম্মোনিয়ম আসিল, মেয়েটি নিজেই বাজাইয়া গাহিল—

এস মা অমল কমলবাসিনী
নারায়ণী বাণী জননি—
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সঙ্গীত-সুধা-
ধারায় ধুইয়া ধরণী।

এস মানবের ধ্যানধারণারতন্ত্রীতে
এস কণ্ঠের মূক কুণ্ঠিত ইঙ্গিতে
এস বিশ্বের শত শকুন্তসঙ্গীতে
সত্য শুভ্রবরণী !

শ্রীমতী কেবলবালার মত কণ্ঠস্বর শ্রবণ-অভিরাম না হইলেও, একটি বালিকার পক্ষে খুবই প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। মেয়েটি ঘামিয়া ভিজিয়া উঠিয়াছিল। আমার আর সহ্য হইল না, একটু উষ্ণ হইয়াই বলিয়া ফেলিলাম—

—"আর কেন ? এইবার যেতে দাও।"

গোবর্দ্ধন কথাটা শুনিল। আমি যদি এরূপ রুক্ষ না হইতাম, তবে এ পরীক্ষা আরও কতক্ষণ যে চলিত, তাহা এখন বলা দুষ্কর।

বাসায় ফিরিয়া গোবর্দ্ধন, আমাদের কয়েকজন বন্ধুর সহিত কন্যার সমালোচনা জুড়িয়া দিল। কন্যা-পরীক্ষা কালে ছিলাম দার্শনিক, বাসায় আসিয়া হইলাম শ্রোতা। আমার এ বিষয়ে যে কোনও বক্তব্য বা মত আছে কিম্বা থাকার প্রয়োজন, একথা আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিল না; বোধ হয় অনাবশ্যক বোধে। মেয়েটীকে কিন্তু আমার অপছন্দ হয় নাই, একটু চাপ দিলেই আমি রাজী হইতাম।

সমালোচনা ক্রমে তর্কে নামিল। তর্ক আসিয়া কলহের স্থান অধিকার করিল। শেষে কন্যার সমালোচনা গিয়া, বন্ধুদের পরস্পর ব্যক্তিগত সমালোচনা আরম্ভ হইল। রাত্রি ১১টা বাজিল, তবু কোন পক্ষই ছাড়ে না। ক্রমে, 'আইনশিক্ষার্থীরা বে-আইনী ভাষা ব্যবহার

করিয়া শুধু ক্ষান্ত হইল না, বে-আইনী কার্য্য পর্য্যন্ত যখন করিতে সমুদ্যত হইয়া উঠিল, তখন আরও পাঁচজনে আসিয়া আমার বিবাহের প্রথম অধ্যায়টি পরিসমাপ্ত করিয়া দিল।

গোবর্দ্ধনেরই জিত হইল। সে আমায় পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল যে মেয়েটি নিতান্ত লাবণ্যহীনা, কুশিক্ষিতা ও অসভ্য। অতএব ও-কন্যা এই বিশাল ভুভারতে আর যাহারই যোগ্যা হউক না কেন, আমার উপযুক্ত মোটেই নয়। আমিও তাই বুঝিলাম। Better luck next time—ভবিষ্যতে আরও ভালোর আশায় বুক বাঁধিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাসের যেমন পড়তা পড়ে, বিবাহ সম্বন্ধেরও দেখিলাম, তাহাই। কোনও না কোন একটা সম্বন্ধ লইয়া ঘটক ঘটকীর দল প্রায়ই আসে, কামাই নাই—যেন একটানা গরুর গাড়ীর শ্রেণী। আমি গোবর্দ্ধনের পশ্চাতে গাদাবোটের মত যাই, গোবর্দ্ধনের মতেই মত দিই, তাহার পছন্দর উপরই যেন আমার সব নির্ভর করে—আমি একটা লুপ্ত অকার বা দুর্গোৎসবের কলাবৌয়ের মত রহিলাম মাত্র। প্রায় ১৫।১৬টি মেয়ে আরও বাতিল করা গেল।

গোবর্দ্ধন এই সব সরলা ভদ্র কন্যাদের যে ভাবে ব্যতিব্যস্ত করিত, তাহা আমার চিন্তাশীল মনে মোটেই ভাল লাগিত না। মেয়েগুলি যেন চীনাদের দোকানের জুতা অথবা হুঁকার দোকানের কলি হুঁকা কিম্বা আমের ঝাঁকার আম! এভাবে যাচাই চলিলে আমাদের কায়স্থসমাজের তাবৎ অনূঢ়া কন্যাই যে বাতিল পড়িয়া যাইবে, এবং আমার ভাগ্যে স্বর্গ হইতে রম্ভা আসিয়া জুটিবে, মুখে কিছু না বলিলেও, এ সত্যে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু গোবর্দ্ধন আমার জীবনতরণীর একমাত্র কাণ্ডারী, তাহাকে কিছু বলিতে পারিলাম না।

তিন বৎসর কাটিল। শেষ আইন পরীক্ষা দিয়া বাড়ী গিয়া শুনিলাম যে, শ্রীমতী ঝুঁপী এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার পিতা নাকি এখনও আমাকেই জামাতৃপদে বরণ করিবার

নিমিত্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। সম্বন্ধও প্রায় ঠিকঠাক, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা প্রথম পরিচ্ছেদেই জানিতে পারিয়াছেন।

কাজেই বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম ও গোবর্দ্ধনকে সকল ব্যাপার জানাইলাম। গোবর্দ্ধন আমায় অভয় দিল। কিন্তু যে ভাবে মেয়ে যাচাই চলিতেছিল তাহাতে মোটেই ভরসা হইল না, অথচ এদিকে পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই আমার বিবাহ সুনিশ্চিত। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম।

একদিন হঠাৎ দ্বিপ্রহরে দিবানিদ্রার পর নীচে গিয়া চিঠির বাক্সে দেখি আমার নামে একখানি অজ্ঞাত হস্তের লিখিত পত্র রহিয়াছে। পত্রে অবগত হইলাম যে, লেখকের একটি অনূঢ়া আত্মীয়া আছেন, তাঁহাকে একবার যেন আমি ও আমার বন্ধু গোবর্দ্ধনবাবু গিয়া দেখিয়া আসি! পত্র পড়িয়া আমি তো আকাশ হইতে পড়িলাম। প্রথমতঃ আমার নাম ও ঠিকানা এবং আমি যে অবিবাহিত এ সংবাদ এই লেখক মহাশয় জানিলেন কি করিয়া! দ্বিতীয়ত, আমার বন্ধু গোবর্দ্ধনকেই বা তিনি চিনিলেন কি প্রকারে, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাকেই বা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অনুরোধ কেন? সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে এক প্রচণ্ড রহস্য বলিয়া প্রতীত হইল। গোবর্দ্ধন তখন বাসায় ছিল না। সে আসিলেই তাহাকে পত্রখানি দেখাইলাম ও আমার আশঙ্কা ও বিভীষিকার কথাও তাহাকে জানাইলাম।

অনেক তর্ক বিতর্ক ও আলোচনার পর স্থির হইল যে একবার গিয়াই দেখা যাউক না কেন ব্যাপারটা কি?

বৈশাখ মাস। অপরাহ্ন। এক পশ্‌লা জল হইয়া গিয়া গুমোটটা কিছু বাড়িয়াছিল। আমরা যুগল বন্ধু নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পত্রলেখকের নাতি-দীর্ঘ বাড়ীর লৌহফটকে গিয়া ট্যাক্সি দাঁড় করাইলাম। বাড়ীটি ছোট; কিন্তু অতি সুন্দর ও সুসজ্জিত। বাড়ী দেখিয়া অনুমান করা গেল যে, এ ভদ্রলোকের বাড়ী এবং গৃহস্বামী ধনী ও সুরুচিসম্পন্ন। যাক্ বাঁচা গেল—তবে গুণ্ডার হাতে পড়ি নাই!

ফটকে দারোয়ান ছিল না, তাহার খালি টুলটি ছিল মাত্র। একটা উড়ে মালী সিঁড়ির দুই পার্শ্বস্থ টবের গাছগুলির মাটি খুঁড়িয়া দিতেছিল। নিরানীটি সিঁড়িতে নামাইয়া সে ছুটিয়া আসিয়া ফটকের ভিতর হইতে ততোধিক দ্রুততর ভাষায় জিজ্ঞাসা কারল—"কঁউঠু আসুছন্তি আপন মানে, অজ্ঞা?"

গোবর্দ্ধন বিরক্ত হইয়া কহিল—"দুত্তোর ব্যাটা, এই কি কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী?"

প্রভুর নাম শুনিয়া, হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস্ (His master's voice) মার্কা জীব বিশেষের মত উদ্‌গ্রীব উদগ্র ও উদ্বেলিত প্রাণে ফটক খুলিয়া দিয়া অতি বিনীত ভাবে কহিল—"হ অজ্ঞা মহাপ্রভু।"

এমন সময় ফটক-প্রাচীরের পিত্তল ফলকে নজর পড়ায় দেখা গেল, লেখা আছে, শ্রীকৃষ্ণকান্ত মিত্র, এম্-এ, বি-এল, ভকীল হাইকোর্ট।" গোবর্দ্ধন বলিল—"এক গোয়ালেরই গরু হে! তবে আর ভয় কি?"

অনেকটা নির্ভয় হইলাম বৈ কি!

গোবর্দ্ধন ভিতরে না ঢুকিয়াই, কহিল—"বাবু আছেন বাড়ীতে? বল্ গে ফটকে দু'জন বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।"

উড়িয়া মালী তাহার দুর্ব্বোধ্য ভাষাকে মুখে পানের পুঁটুলি পুরিয়া দুর্ব্বোধ্যতর করিয়া কি বলিল বুঝা গেল না, তবে তাহার ভাবে বুঝিলাম যে আমাদিগকে ভিতরেই আমন্ত্রণ করিল। সে নিশ্চয় আমাদিগকে মক্কেল ভাবিয়াছিল। কিন্তু গোবর্দ্ধনের তাড়া খাইয়া বাবুকে খবর দিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে দৌড়িল।

গোবর্দ্ধন বাস্তবিকই খুব সাহসী, ভয় বলিয়া কিছু সে জানিত না। এই ব্যাপারে গোড়া হইতেই আমার মনে একটা কেমন খটকা লাগিয়াছিল, কিছুতেই সেটা, গোবর্দ্ধনের এত যুক্তি ও সাহসসত্ত্বেও মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিলাম না। গোবর্দ্ধন কিন্তু বেশ প্রফুল্ল। আমার বুক দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, বর্ম্মা চুরুট মুখে, গেঞ্জী গায়ে, কোঁচান' সাদা ধুতি পরা, কোঁচাটি পেটের উপর গোঁজা, নাতিউচ্চ ভুড়ি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, হিল্লোলিত শ্বেতকৃষ্ণ শ্মশ্রু, প্রৌঢ় কৃষ্ণকান্তবাবু চটি ফটাস্ ফটাস্ করিতে করিতে দ্রুতপদে ফটকের দিকে আসিতেছেন। গোবর্দ্ধন ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি ফটকে ঢুকিয়া এক একটি নমস্কার করিয়া মধ্যপথে তাঁহার সহিত গিয়া মিলিত হইলাম।

আমাদিগকে একটু নিরীক্ষণ করিয়া কৃষ্ণকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি বেণেটোলা হ'তে আসচেন?"

গোবর্দ্ধন সস্মিতভাবে উত্তর দিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

"আসুন, আসুন, আমিও তাই ভাবছি, এখনো এলেন না কেন! জলটার পরেই বুঝি বেরিয়েছিলেন?"

বলিতে বলিতে অগ্রগামী কৃষ্ণকান্তবাবু আমাদিগকে

একটা প্রকাণ্ড সাহেবী সজ্জায় সুসজ্জিত হলঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

অল্পক্ষণেই সম্বর্দ্ধনার প্রচুর আয়োজন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া দিল।

জলযোগান্তে তিনি আমাদের উভয়েরই নাম, পিতৃনাম, নিবাস, গোত্র, পর্য্যায় প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য পরিচয় লইয়া খুবই খুশী হইয়া জানাইলেন যে, আমরা উভয়েই তাঁহাদের পাল্টা ঘর।

আমার ন্যায় অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তির সন্ধান ইনি কি করিয়া পাইলেন জানিবার জন্য আমার মন এত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল যে আমি আর সে চাঞ্চল্য চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম—"আপনি আমার সন্ধান পেলেন কি করে?"

কৃষ্ণকান্তবাবু একবার অন্দর-অবরোধী পর্দ্দার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"তোমার—ওই যে আপনার ন্যায় কৃতী ছাত্রের নাম ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডারটা খুল্‌লেই তো জানা যায়।"

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল—"ঠিকানা?"

কৃষ্ণকান্তবাবু সহজ ভাবেই কহিলেন—"আপনাদের অধ্যাপক গোবিন্দবাবুর কাছে।"

সমস্ত মেঘ ও ময়লা কাটিয়া গিয়া এতক্ষণে মনটা কতক প্রফুল্ল ও প্রসন্ন হইল। আর এতক্ষণ কথাবার্ত্তাতে এটিও ধারণা হইয়াছিল যে গুণ্ডা বা জুয়াচোরের হাতেও পড়ি নাই।

কিন্তু মেয়ে কৈ? বাজে বাক্যালাপেই তো সময় কাটে! ভাবিলাম, মেয়ে বোধ হয় ময়লা, তাই দিনের আলোয় দেখাইতে নারাজ। রাত্রে

বিদ্যালোকে দেখাইলে তবু অনেকটা ফর্শা লাগিবে, এই উদ্দেশ্যে বোধ হয় ইনি অযথা বিলম্ব করিতেছেন। মনটা আবার একটু ছোট হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমি কিন্তু অধৈর্য্য হইতেছিলাম।

আরও দুই চারিটি এ-কথা সে-কথার পর কৃষ্ণকান্তবাবু নিজেই প্রস্তাব করিলেন—"তাহলে এইবার মেয়েকে নিয়ে আসুক, কি বলেন ?" বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই, হাঁকিলেন—"পরেশ খুকীকে নিয়ে এস।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পরেশ নামক একটি ২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক খুকীনাম্নী একটি কিশোরীকে—যুবতী বলিলেই ভাল হয়—লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া, আমাদিগকে হাত তুলিয়া এক একটি নমস্কার করিয়া দুইজনে দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিল।

ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। কি রূপ! এত মেয়ে দেখিয়াছি, এমন লাবণ্যভরা রূপবতী মেয়ে তো একটিও চোখে পড়ে নাই! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অনিন্দ্য মুখশ্রী, আসন্ন যৌবনের অরুণাভায় লাবণ্য যেন উছলিয়া উপচিয়া পড়িতেছিল। আমি দেশকাল সব ভুলিয়া গিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া কতক্ষণ যে তাহার লজ্জানত অথচ সহজ সুন্দর মুখপানে তন্ময় হইয়া চাহিয়াছিলাম জানিনা—হঠাৎ পরেশের সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় আমার জ্ঞান হইল, এ কি করিতেছি, ছিঃ।

গোবর্দ্ধন তো হতভম্ব! সুন্দর মুখের, বিশেষতঃ সুন্দরীর জয় সর্ব্বত্র। তাহার জারিজুরি সব স্তব্ধ!

আমাদের ভাব দেখিয়াই হউক বা যে কোনও কারণেই হউক চাতুর্য্যের অবতার উকীল প্রৌঢ় কৃষ্ণকান্তবাবু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। কহিলেন যে—তিনি নিঃসন্তান। পরেশ তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভাগিনীর

পুত্র—মুচিপাড়া থানার দারোগা। আর এই কন্যাটি তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর একমাত্র কন্যা—নাম বিজয়িনী ঘোষ। কন্যা কোনও স্কুল কলেজে যায় নাই, বাড়ীতেই পড়ে, এখন আই-এ পড়িতেছে। গৃহকর্ম্মও তাহার উত্তমরূপ জানা আছে।

এমন সময় আর একটি কন্যা আসিয়া, কৃষ্ণকান্তবাবুর সম্মুখস্থ টীপয়ে একটি পানভরা ডিবা রাখিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল।

কৃষ্ণকান্তবাবু পানের ডিবাটি আমাদের দিকে সরাইয়া দিয়া কহিলেন—"এই আমার আর একটি ভাগ্নি, পরেশের সহোদরা। এটিকেও পার করতে হবে। এটিও আমার কম লক্ষ্মী নয়। তবে এর একটি দোষ আছে—"

"যান" বলিয়া বালিকাটি মামার পশ্চাতে মুখ লুকাইল। কৃষ্ণকান্তবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দোষটা কি জানেন? এ "শ" বলতে পারে না, সবই এর "স"। আর বৌমায়ের সঙ্গে একটু আধটু ঝগড়া করে।"

মেয়ে মামার কোলে মুখ লুকাইল। কৃষ্ণকান্তবাবুর সহিত আমরাও হাসিতে লাগিলাম।

এ মেয়ের রূপও অনবদ্য, বয়স ১২।১৩—নাম শৈলজা। বাড়ীতেই ইংরাজী ও বাঙ্গলা পড়ে। শৈলজার চোখে মুখে বালিকাসুলভ চঞ্চলতা ও কৌতুক ঠিকরিয়া পড়িতেছিল, বিজয়িনীর মত স্থির ধীর বোধ হইল না।

গোবর্দ্ধন নানা ভণিতা করিয়া কন্যার কোনও ঠিকুজী আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, দুই মেয়েরই ঠিকুজী আসিল। বিজ্ঞ জ্যোতিষীর মত

বিশেষ মনোযোগের সহিত দুইখানিই পরীক্ষা করিয়া, কন্যার বাম হাতের করসামুদ্রিক পর্য্যন্ত দেখিল।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন দেখলেন?"

গোবর্দ্ধন গম্ভীরভাবে উত্তর—"মন্দ নয়—বিশেষ কোনও—কিছু নেই—"

আমার এ সব চালাকী একেবারেই ভাল লাগিতেছিল না। আমার সর্ব্ব অঙ্গ একবাক্যে বলিতেছিল—কোনও দোষ নেই, কোনও দোষ নেই। গোবর্দ্ধনের উপর আমার সত্য সত্যই রাগ হইতেছিল, কি একটা যা-তা না চট করিয়া বলিয়া বসে।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা ছাড়িয়া গোবর্দ্ধন অন্য পন্থা অবলম্বন করিল। বলিল—"মেয়ে লেখাপড়া তো বেশই শিখেছেন, দৈহিক সৌন্দর্য্যও আছে, এখন সাংসারিক কাজকর্ম্ম কি জানেন সেটা—"

খুব সপ্রতিভ ভাবেই গোবর্দ্ধন পরেশের পানে চাহিয়া কথা কয়টি জিজ্ঞাসা করিল, বোধ করি সোজাসুজি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইল না।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"সাংসারিক কাজকর্ম্ম মানে?"

গোবর্দ্ধন কহিল—"পরিচয় পেলেন তো যে বলরামবাবুরা পল্লীগ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থ; সেখানে এত দাসদাসী চাকর বামুন তো নাই? কাজেই এঁদের ঘরে যেতে হলে সংসারের কাজ সবই তো জানা দরকার—"

পরেশ কহিল—"তা' এ মেয়ে সবই জানে। জানে না কেবল গাই দুইতে, ঘর ছাইতে, মোড়া বানাতে, গরুর গাড়ী হাঁকাতে—"

গোবর্দ্ধন ছাড়া সকলেই উচ্চহাস্যে কক্ষখানি কাঁপাইয়া তুলিল। শৈলজা উচ্চৈঃস্বরে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; বিজয়িনী কেবল মুখে রুমাল গুঁজে ও ঢোক গেলে। কৃষ্ণকান্তবাবু কাসিতে কাসিতে বারান্দায় গেলেন। গোবর্দ্ধন কিন্তু চটিল, তাহার ক্ষুণ্ণ গর্ব্ব, মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল।

পরেশ কিন্তু দমিল না, সে মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"বল্‌না তুই, আর কি পারিস্ না? এই মাঠে ভাত নিয়ে যেতে, লাঙ্গল দিতে, হাত নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করতে—বল্‌না?"

গোবর্দ্ধন উঠিয়া দাড়াইল, কহিল—"থাক্ মশায়, আর কাজ নেই! আমরা চল্লুম।"

পরেশ খপ্ করিয়া গোবর্দ্ধনের দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—"চটেন কেন গোবর্দ্ধনবাবু? আপনি এমন একজন ওস্তাদ মেয়ে-দেখিয়ে লোক, উকীল হতে চলেছেন, প্রতিপক্ষের একটা কথাতেই একবারে যদি রেগে ওঠেন, তা হ'লে চলবে কি করে? মেয়েকে জেরা করুন, গাইতে, বাজাতে, নাচতে পারে কি না, আইন জানে কি না, ডাক্তারী জানে কি না, সুধুন্—"

গোবর্দ্ধন সরোষে কহিল—"মেয়ে দেখানোর প্রথা যখন আবহমান কাল থেকে আছে, তখন এটাকে ঠাট্টা করলে তো চলবে না। আমরা মফঃস্বলের লোক আমাদের দেশে মেয়ে-দেখা আছে, আপনাদের মধ্যে যদি "কোর্টশিপ" করে বিয়ে করার রীতি থাকে, তাহ'লে অবশ্য এ সবের প্রয়োজন হয় না। যাক্ গে, কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই; আমরা এখানে অপমানিত হ'তে নিশ্চয়ই আসি নি।"

পরেশ একটু থতমত খাইয়া গেল। কোনও রকমে একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল—"একটা ঠাট্টায় যে আপনার অপমান হয়, এটা আমার জানা ছিল না। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য আমি মাপ চাইচি! 'এখন মেয়ের হাঁটুতে কি চিহ্ন আছে একবার দেখবেন না?'

গোবর্দ্ধনের মুখের রং পরিবর্ত্তিত হইল। কহিল—"হাঁটুর চিহ্ন কি রকম?"

পরেশ কহিল"—সেই যে কুমারটুলিতে ভগবানবাবুর মেয়ের দেখতে চেয়েছিলেন, মনে নাই?"

কিছুদিন পূর্ব্বে কুমারটুলিতে একটি মেয়ে দেখিতে গিয়া, গোবর্দ্ধন এই অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়াছিল বটে। তাহার ফল এই ফলিয়াছিল যে আমরা কেবল মাত্র প্রহৃতই হই নাই, বাকী যাহা ভদ্রলোকেরা এ ক্ষেত্রে করিয়া থাকেন তাহার সমস্তই আমরা ভোগ করিয়াছিলাম।

গোবর্দ্ধন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পরেশের দিকে চাহিল। আমার মাথাটা লজ্জায় নুইয়া পড়িল। গোবর্দ্ধন নীরব।

পরেশ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা গোবর্দ্ধনবাবু, নৃসিংহবাবুর মেয়ে কেমন দেখলেন? ঐ যে মশায়, কাশীপুরের নৃসিংহ মুন্সী!"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! একি? এ সব গোপন তথ্য এরা জানিল কি করিয়া?

কাশীপুরের এই মেয়ে আই-এ পাশ। সে দুইঘণ্টা ব্যাপী আমাদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া, শেষে স্বামীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যখন গোবর্দ্ধনকে প্রশ্ন করিল, তখন আমরা তো অবাক্! এত বড় দুর্দ্ধর্ষ মেয়ে সে।

গোবৰ্দ্ধনের রোষ-বহ্নিতে অকস্মাৎ কে যেন জল ঢালিয়া দিল। এ-গোবৰ্দ্ধন যেন কিছুক্ষণ আগের সে-গোবৰ্দ্ধন আর নয়। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"মাপ করবেন পরেশবাবু, সে সব কথা এখানে কেন? কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি, আপনি এ সব খবর পেলেন কোথা থেকে?"

পরেশ অভিনয়ের সুরে গর্ব্বিত ভাবে শিরশ্চালনা করিতে করিতে গম্ভীর ভাবে কহিল—"মশায় আমরা হচ্চি সি, পি, অর্থাৎ ক্যালকাটা পুলিশ—আমরা সবজান্তা! দেখছেন তো, আপনাদের সব কীর্ত্তিই আমি জানি, কেন আর ভোগান?"

আমার সন্দেহ হইল, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে আমাদের দলস্থ কোনও লোক আছে। আমাদিগকে অপমানিত করিবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র হইয়াছে। বিবাহপ্রস্তাব সব মিথ্যা। গোবৰ্দ্ধন চিন্তিত হইয়া পড়িল।

এমন সময় কৃষ্ণকান্তবাবু ফিরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হ'লে খুকী এখন যেতে পারে?"

গোবৰ্দ্ধন সানন্দে অনুমতি দিয়া বিদায় ভিক্ষা করিল। কৃষ্ণকান্তবাবু বাধা দিয়া কহিলেন—"হাঁঃ, তা কি হয়? রাত্রে দুটি খেয়ে—"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আহারান্তে পুনর্ব্বার সেই কক্ষে আসিয়া বসা গেল। পরেশের সঙ্গে গোবর্দ্ধনের রীতিমত সন্ধি হইয়া ইহারই মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব পর্য্যন্ত জমিয়া উঠিয়াছে। গোবর্দ্ধন, পরেশ ও আমি তিনজনে তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছি, এমন সময় একটা ফতুয়া গায়ে, পান চিবাইতে চিবাইতে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে অন্দরের পর্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল জয়হরি।

একি? এ ম্যাজিক, না বায়োস্কোপ দেখিতেছি? আমার মাথার মধ্যে গোলমাল হইয়া উঠিল। গোবর্দ্ধন লাফাইয়া উঠিল—"একি? জয়হরি যে! তুমি এখানে?"

জয়হরিও কৌতুক হাস্যে আমাদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—"অ্যাঁ দাদা, তোমরা এখানে?"

আমার তো মুখ দিয়া কথাই বাহির হইতেছিল না, আমি এত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম!

পরেশ কহিল—"ইনি আমার সদ্যার্জ্জিত নিকট কুটুম্ব। তুমি আমার কে হও হে—?"

আর আমাদের বুঝিতে বাকী রহিল না, যে আমাদের যাবতীয় গুপ্ত রহস্য কি করিয়া পরেশের কর্ণগোচর হইয়াছে।

জয়হরি আমায় কহিল—"ওহে বলরাম, তোমায় ভিতরে একবার ডাকচেন।"

ভিতরে আমায় ডাকচেন ? কি সর্ব্বনাশ ! আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চট্ করিয়া কথাটা ধারণা করিতে পারিলাম না।

পরেশ কহিল—"যান না মশায়, শুনেই আসুন না ? বাঘ তো সেখানে কেউ নেই যে, আপনাকে ধরে খেয়ে ফেলবে ? এত ভয় কেন ?"

আমি কল্পনা করিতে পারি অনেক, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে গেলেই পৃথিবীর যত লজ্জা আসিয়া আমায় চাপিয়া ধরে। এতক্ষণ গোবর্দ্ধন কত কথা কহিল, কত তর্ক করিল, কেমন সহজ ভাবে হাসিতেছে, গল্প করিতেছে—কিন্তু আমি যে চুপ করিয়া বসিয়া আছি, চুপ করিয়াই আছি। কেবল মধ্যে মধ্যে দন্ত বিকশিত করিয়া পরিচয় দিতেছি যে, কথাবার্ত্তা যাহা হইতেছে আমি তাহার কতক কতক বুঝিতেছি !

পরেশের অভয় বাণীতেও তাহাই করিলাম। হাস্যবিহীন দন্তরাজি বিকশিত করিলাম মাত্র। কিন্তু উঠিয়া যাইবার কোন চেষ্টাই করিলাম না। এ সব কি একটা বিরাট পরিহাস না কি ? আমার মাথাটা ঘুরিতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন কহিল—"যাও না, যাও না, শুনেই এস না ?

অগত্যা উঠিলাম। পদদ্বয় কাঁপিতেছিল, হৃৎপিণ্ড এত দ্রুত আঘাত করিতেছিল যে, তাহার প্রত্যেক শব্দটি পর্যন্ত আমি শুনিতেছিলাম।

পরেশ কহিল—"ওরে বাবাঃ, এ যে একেবারে ছ.ই লক্ষ্মণ, দাদার আজ্ঞা ছাড়া এক পাও কোথাও নড়েন না ! কি অপূর্ব্ব দাদৃ-ভক্তি !"

জয়হরি আগে আগে চলিল। একটা বারান্দা পার হইয়া, অন্দর মহলে একটা বিস্তৃত অথচ সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া উঠিলাম। জয়হরি

কহিল—"এইখানে বস'।" বসিলাম, জয়হরিও একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। উভয়েই নীরব।

মিনিটখানেক পরেই দেখি, আমার বৌদিদি মা ও পিসীমা হাসিতে হাসিতে আসিয়া সেই ঘরে ঢুকিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া, আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিলাম না; মাথার ভিতরে হঠাৎ কি খট্ করিয়া উঠিল, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম।

কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলাম জানি না, জ্ঞান হইলে দেখি বৌদিদি আমার মাথায় হাত বুলাইতেছেন, মা ও পিসীমা অশ্রুসজল নয়নে আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া, আর অদূরে কৃষ্ণকান্তবাবু, তাঁহার পত্নী, পরেশ, গোবর্দ্ধন, জয়হরি এক একখানি চেয়ারে ম্লানমুখেশঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বসিয়া। শৈলজা আমার নাকে স্মেলিংসল্ট শুঁকাইতেছিল। আমি উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকিত কক্ষে দুগ্ধফেননিভ এক সুকোমল শয্যায় শয়িত।

আমায় চক্ষু মেলিতে দেখিয়াই কৃষ্ণকান্তবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এ তো শক্ লাগবার কথাই বটে। আমি পই পই করে বিনুকে আর পরেশকে বল্লুম যে, এ সব থিয়েটার করে কাজ নেই—তোমরা তো তা শুনলে না বাপু—হেঁঃ—যাও, এখন ঘুমুতে দাও। বলরাম তুমি ঘুমোও বাবা।" বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

বিনু আমার বৌদিদি বিনতা।

মা ও পিসীমা "ষাঠ ষাঠ" করিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গোবর্দ্ধন আমার কাছে আসিয়া কহিল—"দূর বলাই, তুই এত নার্‌ভাস্ ?"

পরেশ কহিল—"তার আর অপরাধ কি ? চলুন শোওয়া যাক্ গে !"

পরেশ ও জয়হরি গোবর্দ্ধনকে লইয়া চলিয়া গেল।

বৌদিদি কৌতুক হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরপো, এখন কেমন বোধ করচ ?"

আমি বলিলাম—"ভালই।"

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন এ মেয়ে পছন্দ হলো তো ? না, আবার এই কলকাতা সহর চেলে বেড়াবে ? বেশ যা হোক্, তোমার পেটে এত গুণ ?"

আমি ম্লান ভাবে একটু হাসিলাম মাত্র।

বৌদিদি কহিলেন—"বল স্পষ্ট করে, ঝুঁপীকে পছন্দ হয়েছে তো?"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঝুঁপী কে ?"

ঝুঁপী গো, আমাদের গাঁয়ের যাদববাবুর মেয়ে। ওঃ হাঁ-হাঁ—ঝুঁপী নাম তো তোমার পছন্দ হবে না—বিজয়িনী, বিজয়িনী।"

ঝুঁপী যে বিজয়িনী, তা কে জানে ? এই ঝুঁপী ? একি ? বিস্ময়ে পুলকে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নিজের বিদ্যা বুদ্ধি অহঙ্কারের উপর একটা ধিক্কার জন্মিয়া গেল। কল্পনায় আমি এমন রত্ন হারাইতে বসিয়াছিলাম ! কি মূর্খ আমি !

কহিলাম "এ মেয়ে আর কার না পছন্দ হয় ?"

বৌদিদি কহিলেন—"তবে ? তবে যে বন্ধুমহলে বলা হোত ঝুঁপীকে বিবাহ করব না। সে কুরূপা, কুশ্রী, অসভ্য, পাড়াগেঁয়ে—"

বাধা দিয়া কহিলাম—"আর কেন লজ্জা দাও বৌদিদি? এই কাণ্ড মল্‌চি! তা' তুমি রেঙ্গুন থেকে কবে এলে? এখানেই বা কি ক'রে? আমায় খোলশা করে সব বল।—আমার বুকের ভারটা লাঘব হোক্! দোহাই বৌদিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আর আঁধারে রেখ না।"

বৌদিদি মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"তোমার এই মেয়ে দেখা ঘট্‌কালীর খবর আমাদের কাছে যখন পৌঁছল; তখন তোমার দাদা আমায় চুপে চুপে পাঠিয়ে দিলেন, তোমার একটা হিল্লে লাগাবার জন্যে। আমি তাই আজ পাঁচদিন হ'ল এখানে এসেছি। কৃষ্ণকান্তবাবু আমার পিসে মশায়। যাদববাবু পিসেমশায়ের ভগিনীপতি। ঝুঁপী এইখানেই বরাবর থাকে। পিসে মশায়ের তো ছেলে পিলে নাই, তিনি ভাগ্নে ভাগ্নীদের নিয়েই সংসার করেন। এই তো কথা! তারপর, আমি এসে তোমায় পত্র দেওয়াই। আর তোমরা এলে! তবে একটু মজা দেখবার জন্য, এতক্ষণ সব ভাঙ্‌তে দিই নাই। তোমরা যে কি কর ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে, তাই একটু স্বচক্ষে দেখে নিলাম!"

"দাদা, এ সব ব্যাপার শুনেচেন নাকি?"

"খুব শুনেচেন। তিনিই তো আমায় পাঠালেন। সেখানকার একজন ভদ্রলোক সপরিবারে এলেন, তাঁদের সঙ্গে আমিও এলাম।"

আমার মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। দাদা কি ভাবিতেছেন? কি লজ্জা!

বৌদিদি সরস স্নেহ হাস্যে কহিলেন—"এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও আর ঝুঁপীকে—থুরী—বিজয়িনীকে স্বপ্ন দেখ।"

ঘুমাইব কি? আনন্দে আমার অন্তর পরিপূর্ণ!

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা পিসিমা ?"

বৌদিদি বলিলেন—"আমি এসে ওঁদিকে আনিয়েচি। পরেশ গিয়ে নিয়ে এসেচে।"

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলাম—"ওঃ একটা বিরাট ষড়যন্ত্র তা'লে করেছ তুমি, বৌদি।"

বৌদিদি স্নেহসরস মৃদুহাস্যে কহিলেন—"তুমি যে ক্ষেপেছ ভাই তাতে এ না করলে কি মেয়ের বাপেদের আর মানমর্য্যাদা থাকতো এ সহরে ? এখন ঘুমোও দেখি। হাঁ, পরশু সকালে তোমাদের দুই বন্ধুরই গায়ে হলুদ।"

"দুই বন্ধুরই ?" আমি তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

বৌদিদি কহিলেন—"হাঁ গো, তোমার বন্ধুবর, তোমার মুরুব্বী, তোমার কর্ণধার ঐ গোবর্দ্ধনবাবু।"

"সে কি, ওর বিয়ে ? কার সঙ্গে ?"

বৌদিদি কহিলেন—"তোমার কোনও ভয় নেই, তোমার জিনিষ হাতছাড়া হতে দেবো না। শৈলির সঙ্গে ওঁর বিয়ে। ওঁর বাড়ীতে আজ সকালে টেলিগ্রাম করিয়ে দিয়েচি।"

"বৌদিদি, তুমি সব পার।" বলিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম।

দরজার পাশে, কে মধুর কণ্ঠে ডাকিল—"ঠাকুজ্জি, দেওরকে পেয়ে কি ঘুমুতেও আজ যাবে না ?"

বৌদিদি ডাকিলেন—"এই দিকে আয়, দেবী, এইদিকে আয়।"

দেখিলাম জয়হরির ভগিনী দেববালা—এখন পরেশের স্ত্রী—আসিয়া সলজ্জ ভাবে বৌদিদির আড়ালে দাঁড়াইল।

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন—"একে চেন ?"

আমি উত্তর দেবার পূর্ব্বেই, দেববালা উত্তর দিলেন—"আর কেন লজ্জা দাও ওঁকে, ভাই ? সে বোঝাপড়া আমি ওঁদের সঙ্গে পরে করব।"

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। গোবর্দ্ধন এখন সীলেটে ওকালতী করিতেছে, সে এখন আমার কুটুম্ব। আমাদের দুইজনেরই একটি করিয়া পুত্রও হইয়াছে।

এখন আমার ঠিকানা শ্রীবলরাম বসু বি-এল্, কেয়ার অফ্ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মিত্র, ভকীল, ১৭নং কাশীরাম দাস লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বাপের কাণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পোষ মাস   আকাশ নীলাভ। ঘরে বাহিরে কোথাও কোনও শব্দ নাই। গৃহসংলগ্ন আম্রবৃক্ষের ঘনপত্রান্তরালে একটি ঘুঘু কেবল কেবল "ঘোঁক্—ঘোঁঘর্ ঘর্—ঘোঁ" "ঘোঁক্—ঘোঁঘর্ ঘর্—ঘোঁ" রবে মধ্যে মধ্যে নিঝুম দ্বিপ্রহরটিকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল। অলস রৌদ্র-খানি নিদ্রাকাতর দুষ্ট শিশুর মত এলায়িত দেহে আড় হইয়া গৃহগাত্রে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার ঘড়িতে বাজিল ঢং ঢং ঢং ঢং চারিটা।

আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে রায় বাহাদুর শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। স্বামীর লম্বা হাইতোলার আওয়াজে সংলগ্ন হল্ হইতে গৃহিণী আসিয়া মেঝেয় দাঁড়াইতেই, খুটবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুব ঘুমিয়েছি, না?" গলা ভার।

গৃহিণী কহিলেন—"তা' ঘুমুবে না? কা'ল যে সারা রাত্তিরটা একেবারে ঠায় বসে' কেটে গেছে! চুরুট এনে দিই?"

"নাঃ, চুরুট এখন থাক্। তুমি শোও নি?"

"শুয়েছিলুম, আমার ঘুমই এলো না।"

"কেন?"

"কে জানে ?"

কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব। হাই তুলিতে তুলিতে মুটবিহারী কহিলেন—"এইবার রজনীর চিঠিখানা নিয়ে এস—দেখি বাবাজী কি লিখেচেন !"

গৃহিণীর মন আহ্লাদে ভরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আয়না-দেরাজের মধ্য হইতে পত্রখানি আনিয়া স্বামীর হস্তে দিয়া, বিছানার উপর পা' ঝুলাইয়া বসিলেন।

মুটবিহারী বলিলেন—"তুমিই পড় ;—আমার চোখ এখানে নেই ; কা'ল রাত্রে গোলমালে কোথায় ফেলেচি, মনে নেই।"

গৃহিণী পড়িতে লাগিলেন—

কলিকাতা
১৩ই পৌষ ১৩৩৩

শ্রীচরণেষু—

মা, কয়েকদিন হইল আপনাদের কোনও সংবাদ না পাইয়া আমরা চিন্তিত আছি। আশা করি, আপনি ও বাবা সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।

গত পরশ্ব মণি আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন এবং রাত্রে এইখানেই ছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার ফল শীঘ্রই বাহির হইবে। আমরা গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছি যে, মণি এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ-তে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। এ খবর এক রকম নিট্ খবরই। বোধ হয়, মণিও এ কথা আপনাদিগকে জানাইয়াছেন।

এইবার তো মণির পড়াশুনা সাঙ্গ হইল ; বিবাহের উপযুক্ত বয়সও হইয়াছে। এতদিন তাঁহার বিবাহ দিতে বাবার অমত ছিল এবং মণিও

বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না ; এখন আশা করি, আর বাবার অমত হইবে না এবং মণিও স্বীকৃত। এমন কি, মণি স্বয়ং তাঁহার বধূও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আমি ও সুলতা গতকল্য দুপুরে গিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া আসিয়াছি।

মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী ; যেমন অপূর্ব্ব গায়ের রং, তেমনি মুখশ্রী। বয়স প্রায় পনের বৎসর। গৃহকর্ম্মে, শিল্পকর্ম্মে ও লেখাপড়াতেও মেয়েটি অতি চমৎকার। আপনার কন্যা তো ইঁহাকে ভ্রাতৃবধূ করিতে অত্যন্ত উৎসুক। মেয়ের নাম মাধবী। আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, আপনারা এই মেয়ের সঙ্গেই মণির বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা করিয়া, যাহাতে আগামী মাঘ মাসের মধ্যেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহারই ব্যবস্থা করেন।

মেয়ের বাপের নাম শ্রীরামকল চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ; নন্‌-কো-অপারেশনের সময় চাকরী ছাড়িয়া এখন স্বরাজ্যপন্থী। আপাততঃ তিনি কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। বর্ত্তমানে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বড় ভাল বলিয়া মনে হইল না। ইঁহার নিবাস কলিকাতা, পটলডাঙ্গায়। ইনি বরপণ কিছুই দিবেন না,—শুনিলাম, ইহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা। আর দিবার মত তাঁহার অবস্থা বলিয়াও বোধ হইল না। মাধবীই জ্যেষ্ঠা কন্যা ; ইহার পরে আরও তিনটি অনূঢ়া কন্যা বর্ত্তমান। দ্বিতীয়টীও বিবাহযোগ্যা। বোধ হয়, অর্থাভাবেই ইনি কন্যাদের বিবাহ দিতে পারিতেছেন না।

তবে রামকমলবাবু অতি ভদ্র ও মহাশয় ব্যক্তি। তিনি নিজে যেমন সুশিক্ষিত, কন্যাগুলিকেও তেমনি সকল রকমে সুশিক্ষিত করিয়াছেন। ধনী না হইলেও, তিনি নীচ বা কদাচারী যে নহেন—

তাহা তাঁহার সহিত সামান্য দু' একটি কথাবার্ত্তা কহিলেই বুঝা যায়।

মোটের উপর এ সম্বন্ধ অবাঞ্ছনীয় নয়। মেয়ের দিক্ হইতে ধরিলে এমন মেয়ে পাওয়া বাস্তবিকই দুর্ল্লভ। বিশেষতঃ মণির যখন এই মেয়েই একান্ত পছন্দ এবং ইঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও মণি যখন বিবাহ করিবেন না বলিয়াছেন, তখন আশা করি, আপনাদেরও এ সম্বন্ধে কোনও অমত হইবে না।

আপনারা আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আজ ১০।১২ দিন হইল অনু এখানে আসিয়াছে। সে পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। আমরা ভাল আছি; শীঘ্র আপনাদের কুশল সহ পত্র দিবেন। ইতি—আপনাদের স্নেহের রজনী।

পত্র পাঠ করিয়া গৃহিণী স্বামীর অভিমতের জন্য উৎসুক হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন।

লুটবিহারী গম্ভীরমুখে কহিল—"দাও ত একটা চুরুট। শরীরটা বড় ম্যাজ্-ম্যাজ্ করচে, মাথাও ধরেচে—জ্বরে না পড়ি আবার।"

গৃহিণী চুরুট, দিয়াশলাই দিয়া ছাইদানটি আগাইয়া দিতে দিতে কহিলেন—"নাঃ ও সব মনে করো না! তোমার ও-রকম রাত-টাত জেগে অত্যাচার করা তো অভ্যেস নাই। শরীর একটু খারাপ হবে বৈ কি!"

গতকল্য রাত্রে লুটবিহারীর বিশিষ্ট বাল্যবন্ধু ঢাকার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট জগন্নাথবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায়, উভয়েরই তাঁহার গৃহে রাত্রি জাগরণ হইয়াছে; তজ্জন্য দুইজনেরই শরীর ও মন দুই-ই তত ভাল নাই।

রামকমলবাবু দিবা রাত্রি সভাসমিতি, চরকা, খদ্দর, সূতা, খাতাপত্র হিসাব প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত। গৃহে আসেন খাইতে,—তাহাও সব দিন ঘটিয়া উঠে না—এবং শয়ন করিতে, যদিও মাসের মধ্যে পনের দিন তিনি থাকেন হয় চট্টগ্রামে, নয় দার্জ্জিলিঙে, কিম্বা শবরমতী আশ্রমে। কাজেই সংসারের সমস্ত ভার পত্নী মেনকারই উপর।

মেনকার পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় মাঝপুরের জমীদার। রামকমলবাবু অতি বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় জয়গোপালবাবুর আশ্রয়ে আসিয়াই মানুষ হয়েন; এবং তাঁহারই অর্থসাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পটলডাঙ্গার এই ভাঙা একতালা বাড়ীটি রামকমলবাবুর পৈত্রিক ভিটা।

ইদানীং, স্বামীর ঈদৃশ স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যব্রত গ্রহণে তিনি স্বামীর উপর অত্যন্ত বিরূপ। মেনকা স্বামীকে তাঁহার পিতার অন্নে পালিত বলিয়া চিরকালই একটু নেক্‌নজরে দেখিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার পিতার তাবৎ অর্থব্যয়ের এরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া রীতিমত শাসন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। রামকমলবাবু পত্নীকে চিনিতেন, তিনি নির্ব্বিকার। মেনকা বকিত, রাগিত, কাঁদিত; আবার আপনা-আপনিই চুপ করিত।

সেদিন হেস্ত-নেস্ত একটা সদুত্তর লইবেনই স্থির করিয়া ভোজনরত স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, বাইরে এত বক্তিমে করে' বেড়াও, আর ঘরে এলেই মুখে অমন গুয়ো দাও কেন?"

সহাস্যে রামকমল কহিলেন—"কারণ, বাইরে আমি কর্ত্তা, ভিতরে আমি কর্ম্ম।"

মেনকা কি বুঝিল জানা গেল না; উষ্ণভাবে কহিল—"আর কর্ত্তা সাজ্‌তে হবে না! দু'পয়সা আন্‌বার ক্ষ্যামতা নেই,—কর্ত্তা! বাবা যে পয়সাগুলো তোমার পেছনে খরচ করেচেন, সেগুলো যদি এমন অপব্যয় না করে' আমার হাতে দিয়ে যেতেন, তা'হলে আমার আজ এত কষ্ট হ'ত না!"

রামকমলবাবু জানিতেন ইহা ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ; তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কোনও রকমে আহার সারিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচেন।

মেনকা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে-করিতে ধরা-গলায় কহিলেন—"নিজে একখানা ভাল কাপড় কি গয়না কখনও চোখেও দেখ্‌লাম না, তার জন্যে দুঃখু করি না, কিন্তু মেয়েগুলোকে নিয়ে পর্য্যন্ত যে কখন একটু সাধ-আহ্লাদ কর্‌তে পেলাম না, এ-কষ্ট আমার ম'লেও যাবে না।—মেয়েমানুষ কাপড়-গয়না পর্‌বে না, কেবল বই পড়লেই, ন্যাকাপড়া শিখ্‌লেই স্বগ্‌গে যাবে। মেয়েরা যেন দর্জ্জির দোকান করবে, আর নয় আপিসে চাকরী কর্‌তে যাবে।"

মাধবী পিতার ভাতে হাওয়া করিয়া মাছি খেদাইতেছিল; ছোট মেয়ে তিনটি স্কুলে গিয়াছে। রামকমল দেখিলেন, বজ্রপাত অবশ্যম্ভাবী। তাই বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, কি বল্‌বে তাই সোজা করে' বল্‌লেই ত' হয়! ভূমিকা ছেড়ে, এখন কি বল্‌বে তাই শীগ্‌গীর করে বলে ফেল।"

মেনকা বিপত্নীক ধনী পিতার আদরিণী কন্যা ছিলেন। পিতার নিরতিশয় গোঁড়ামির দরুণ মেনকার নৈতিক, সামাজিক বা ব্যবহারিক

কর্ত্তা নীরবে জানালা দিয়া বাগানের পানে চাহিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন। গৃহিণী সবিনয়ে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা'হলে বল, তোমার মত কি? জামাই এত খুঁটিয়ে যে ছ'পাতা একখানা চিঠি লিখ্‌লেন, তার কিছু উত্তর দিতে হবে তো?"

কর্ত্তা ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিলেন—"বাবাজী হাইকোর্টের উকীল কি না? তাই মুশোবিদেটা ভালই করেচেন। কিন্তু তাঁর কেস্‌ যে বড় খারাপ।"

বলিয়া অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে পত্নীকে একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইলেন। গৃহিণী আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার মুখবর্ণ পাংশু হইয়া গিয়াছিল। সকাতরে জিজ্ঞাসুভাবে স্বামীর মুখপানে নীরবে কেবল চাহিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুর আত্মপ্রসন্নভাবে কহিলেন—"এ বিয়ে হ'তে পারে না; অন্তত আমি বেঁচে থাকৃতে তো নয়ই।"

গৃহিণী সভয়ে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

কেন? তবে শোন। প্রথমতঃ—আমি এ পীরিতের বিয়েতে নিতান্ত নারাজ। তার কারণ, একে তো আজকালকার ছেলে, তাতে বউ হবেন উপন্যাসের নায়িকা—অবশেষে নিজের ছেলেটি পর্য্যন্ত হাতছাড়া হয়ে যাবে? আর, বউ যে-পরের মেয়ে সেই-পরের মেয়েই র'য়ে যাবেন। দ্বিতীয়তঃ—বেয়াই হচ্ছেন কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদক, স্বরাজী,—নিশ্চয়ই খুব খদ্দর-টদ্দর পরেন, সভা-টভায় বক্তৃতা দেন,—নন্‌কোঅপারেশনের একজন পাণ্ডা, গবর্ণমেণ্টের একজন প্রকাশ্য শত্রু। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলে, এই ছাব্বিশ বছরের

১২০০৲ টাকা বেতনের চাক্‌রীটির গায়ে জল দিয়ে, বাকী দিনগুলি পুত্র-পুত্রবধূর প্রেমালাপ শ্রবণ করেই কাটাতে হবে। তাতে আমি একেবারেই প্রস্তুত নই। তৃতীয়তঃ—এমন ঘরে বিয়ে কর্‌লে মণিরও ভবিষ্যৎটি একেবারে ঝর্‌ঝরে হয়ে যাবে; অর্থাৎ সরকারী চাক্‌রী আর তার হবে না। তখন পুত্র বধূকে খাওয়াবেন কি? চতুর্থতঃ—কাজ কর্‌তে হয় সমানে সমানে। কোথায় আমি, আর কোথায় সেই লক্ষ্মীছাড়া ভ্যাগাবণ্ড, হা'ঘরে—ঘরে যার অন্তভক্ষ্যোধনুর্গুণ! শুধু ছেলের লভ্‌ দেখলে ত' চল্‌বে না—একটা সমাজ ও লোকাচার আছে ত? লোকে আমায় বল্‌বে কি? পঞ্চমতঃ—আমার ঐ এক ছেলে। তার বিয়েতে কিছুই নেব' না? কেন? পাঁচ পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দিলুম—যথাসর্ব্বস্ব পুঁজি ভেঙে, গড়ে' মেয়ে-পিছু পাঁচ-পাঁচ হাজার করে' খরচ করলুম—জানো তো? ছেলেকে এত পয়সা খরচ করে পড়ালুম—কেন, তার কিছুও উশুল কর্‌ব না? কোন্ বরের বাপ টাকা না নেয়? এমন নয় যে আরও ২।৪টা ছেলে আছে, একটার বিয়ে না হয়, অমনিই দিলুম। রজনী আজ শালার হয়ে ছ'পাতা চিঠি লিখেচেন,—কৈ, তাঁর যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন নিজের বাপকে এম্‌নি একটু ধর্ম্মকথা শোনাতে পারেন নি? আমার মেয়ে কিসে হীন ছিল? তারপর, ক'ল্‌কাতার সব লোককে বিশ্বাস নেই—ওরা না পারে এমন কার্য্য নেই। আমি জানি—একজন নমঃশূদ্র একজন বামুণ সেজে এক বামুণের মেয়ে বিয়ে করেছিল। তাই নিয়ে খুব একচোট মকদ্দমা পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল্। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার কিন্তু ক'লকাতার বামুণের হাতে জল পর্য্যন্ত খেতে প্রবৃত্তি হয় না! হিঁদুয়ানী ওদের কিছুমাত্র নেই।"

যুক্তিগুলি গৃহিণীর মনে লাগিলেও, তিনি প্রসন্ন অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল—সেই সুন্দর মুখখানি, যাহা তাঁহার একমাত্র পুত্র এত ভালবাসে, তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়? পুত্র যাহাকে হৃদয় দান করিয়াছে, সে তো পুত্রবধূ হইয়াই গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কল্‌কাতায় কি তবে বামুণ নেই? এ যে তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি। শুন্‌লে গা' জ্বলে যায়।"

রায় বাহাদুর লুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌—পূর্ব্ববঙ্গ বিভাগের ডেপুটি-পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল। হাকিম—মেজাজ কড়া। চিরকাল পোষ্ট আফিসের মেষপালের উপর হাকিমী করিয়া তাঁহার মেজাজটাই হইয়া গিয়াছিল অন্য রকমের। অপরাপর উচ্চপদস্থ হাকিমেরা অনেক সমালোচনা, প্রতিবাদ, তর্ক সহেন; তাঁহাদের কৃত-কার্য্যের অপ্রীতিকর সমালোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদিগকে সময় সময় বিপন্নও করিয়া তোলে; কিন্তু ডাকঘরের হাকিমদের এ-সব বালাই নাই। তাঁহাদের কথাই আইন, ইচ্ছাই বিধি, বিচারই ন্যায়। চোখ রাঙাইয়াই তাঁহারা কার্য্য লইতে অভ্যস্ত। কাজেই জামাতার পত্রে যে বিরক্তি ধূমায়িত হইয়াছিল, পত্নীর রূঢ় প্রতিবাদে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কারণ, কতক স্বভাবে কতক অভ্যাসে কাহারও প্রতিবাদ রায় বাহাদুর সহিতে পারিতেন না। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছিল, কর্ণমূল রাঙিয়া উঠিয়াছিল, নাসাগ্র স্ফীত হইয়াছিল; রুক্ষ কর্কশ স্বরে কহিলেন—"তুমি মূর্খ মেয়েমানুষ, হিন্দুশাস্ত্রের কথা কি ছাই জান কিছু? ক'লকাতার বাসিন্দা বামুণরা সন্ধ্যা-আহ্নিক করে না, খেতে বসে গণ্ডুষ করে না, শৌচে বসে' কাণে

পৈতে দেয় না, শিখাও ধারণ করে না। তারা ময়রার দোকানের পক্কান্ন খায়, বাজারের শিঙ্গাড়া-কচুরী খায়, কশাইয়ের দোকানের মাংস খায়, কলের জলে ঠাকুর-দেবতার সেবা-পূজো করে, ঐ জলে ভোগ পর্য্যন্ত দেয়। তারা এনামেলের বাসনে সরে, ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া কাপড়েই সব কাজ করে, ঘুম থেকে উঠেই মুখ না ধুয়ে চা' খায়, ছত্রিশ জাতের জল-সুদ্ধ দোকানের খিলি-পান খায়, সোডা লেমনেড্ খায়, গঙ্গা নেয়ে মুসল্মানের গাড়ীতে চড়ে বাড়ী ফেরে—এমন কি, বামুণের ছেলে পৈতে গ্রন্থি দিতে পর্য্যন্ত জানে না! এই তো ক'লকাতার বামুণ! ছিঃ—"

বাড়ীতে মোটে দুইটি প্রাণী, কর্ত্তা ও গৃহিণী—অবশ্য ঝি-চাকর বাদে। কর্ত্তার বয়স ৫৩, গিন্নির ৪৫ বৎসর। বয়স হইলে কি হয়, মুটুবাবুর স্বাস্থ্য এত সুন্দর, সবল ও পুষ্ট যে, তাঁহাকে দেখিলে সহসা কেহ পঁয়তাল্লিশের অধিক অনুমান করিতে পারিত না। শক্ত সতেজ উন্নত বপু, দীর্ঘ অবয়ব, পেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহুযুগল, নিত্য-ক্ষৌর-মসৃণ প্রশস্ত গণ্ডযুগলের নীচে বিস্তৃত মুখমণ্ডলের সীমানির্দ্দেশক উভয়দিকস্থ স্থূল যুগ্ম-অস্থি, রায় বাহাদুরের নিটোল স্বাস্থ্যেরই পরিচয় দিত। মাথা-জোড়া তকতকে টাকখানির নীচে, পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িয়াছে একটি নাতিস্থূল শিখা।

তিনটি দিবারাত্র ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াও স্বামীর মত ফিরাইতে না পারিয়া, গৃহিণী আর এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়া, সারাদিন মৌন বিরসভাবে কাটাইতেছিলেন। তবুও নিস্তার নাই। যতই মনে করিতেছিলেন যে, উগ্রপ্রকৃতি, কোপনস্বভাব,

মদগর্ব্বিত স্বামীর ইচ্ছার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কোনই সুফল ফলিবে না, বা একবার যাহা 'না' হইয়াছে, তাহা আর 'হাঁ' হইবে না—তবুও তাঁহার মন কিছুতেই শান্ত হইতেছিল না। একদিকে একগুঁয়ে পতির অমত, অন্যদিকে একমাত্র পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যের দোটানায় তাঁহার মনটা আকুল হইয়া উঠিল। আজ ৩২ বৎসর স্বামীর ঘর করিয়া এই প্রৌঢ় বয়সে গৃহকর্ত্রীর স্বর্ণসিংহাসনে একচ্ছত্রাধিষ্ঠাত্রী হইয়াও তিনি কি জানেন না যে, তাঁহার ইচ্ছার কোনও মূল্য নাই, তাঁহার কোনও কার্য্যে স্বাধীনতা নাই, তিনি এ বাড়ীর কেহই নহেন? তিনি জানেন, তবু মন মানে না। স্বামীর ঈদৃশ দুর্বিনীত অনধিকারে তাঁহার ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে না পাইয়া, কখন কখনও তিনি বিদ্রোহী হইতেন বটে, কিন্তু তাহা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। কাজেই এই আসন্ন বার্দ্ধক্যেও পত্নীর প্রীতির ভিতর একটা ফেউ লাগিয়া, মধুর দাম্পত্য রসধারাটিকে কখনই অবাধ, সহজ এবং সহৃদয় হইয়া উঠিতে দেয় নাই।

রাত্রি সাড়ে আটটা। রায় বাহাদুর সাতটা হইতে সন্ধ্যায় বসিয়াছেন, নয়টায় উঠিবেন। গৃহিণী নিঃসঙ্গ-বিরূপ মনটি লইয়া কেবলই চঞ্চল হইয়া এদিক ওদিক—একবার রান্নাঘর, একবার ভাঁড়ার-ঘর করিয়া মিছে কাজে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, কোনও রকমে সময় ক্ষেপণ করিতেছিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই—"ওঁ নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" বলিতে বলিতে রায় বাহাদুর আহ্নিক-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া গরদের ধুতি পরিয়া গায়ে শাল

জড়াইয়া পায়ে কাষ্ঠপাদুকা দিয়া বাহিরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁহার কর্কশ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়াই চা ভিজাইতে দিয়াছিলেন, চা ও দুইটি সন্দেশ দিয়া জায়গা করিয়া দিলেন।

চা পানান্তে গরদ ছাড়িয়া সূতী কাপড় পরিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে রায় বাহাদুর উপবেশন-কক্ষে গিয়া বসিলেন। ভৃত্য তাওয়া দেওয়া তামাক দিয়া গেল।

গৃহিণী দরজার কাছে দাঁড়াইয়া—ম্লান মৌন বিষণ্ণ গম্ভীর।

উভয়েই নীরব। গৃহিণী কহিলেন—"তা' হলে রজনীকে লিখে দিই যে ওখানে বিয়ে হবে না।"

নটুবিহারী কহিলেন—"হাঁ, তাই দিও।"

"কিন্তু ছেলেটা এতে একেবারে মুষ্‌ড়ে যাবে। বড় আশা ভঙ্গ হবে।"

কর্ত্তা বিচক্ষণ ভাবে মাথা দোলাইতে দোলাইতে কহিলেন—"এখন তাই বল্‌চ' বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে আবার তুমিই অন্য-রকম বল্‌বে। যখন আপাদমস্তক সোণা-হীরেয় মোড়া রাঙা টুকটুকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণের মত একটি বৌ এনে দেব, তখন কোথায় থাক্‌বে তোমার ছেলের ঐ লভ্‌, আর কোথায় থাক্‌বে ছেলের মায়ের আজ্‌কের এই খেদোক্তি।"

গৃহিণী সম্বৃতঅশ্রু রুদ্ধঅভিমানে কহিলেন—হাঁ, তা' কর্‌বে বটে, তবে আমি দেখতে পাব' না। কবে জগন্নাথবাবুর স্ত্রীর মত পুট্‌ করে মরে' যাব, এত সাধের ছেলের বোয়ের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাব না।"

কর্ত্তা কিঞ্চিৎ উষ্ণ ভাবে কহিলেন—"কি বিপদ! ছেলের বিয়ে কি

পালিয়ে যাচ্ছে? মেয়ের বিয়ের জন্যেই লোকে উতলা হয়, জানি, কিন্তু ছেলে যে অরক্ষণীয় হয় তা তো জান্‌তুম্ না।"

গৃহিণী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন—"আমার কেবলি মনে হচ্ছে যে, শীগগির মণির বিয়ে না হলে, তার বৌ দেখা আমার অদৃষ্টে ঘট্‌বে না! আমি আর বেশী দিন বাঁচব না—"

মাথার উপরে একটি টিক্‌টিকী করিল—টক্ টক্ টক্।

গৃহিণী কহিতে লাগিলেন—"ঐ দেখ, সত্যি সত্যি! ঠিক জানি আমি, এই স্বামীপুত্তুর সাজানো গোছান ঘরগেরস্থালী ফেলে, জগন্নাথ-বাবুর স্ত্রীর মত আমায় যেতেই হবে—মণির বৌ দেখা আমার ভাগ্যে নাই; কথায় টিক্‌টিকী পড়েচে, দেখলে ত?"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন "টিক্‌টিকী তো মণির মামা নয়? যার যেখানে ভবিতব্যতা, তার সেখানে ঠিক সেই দিনে বিয়ে হবেই—বৃথা চিন্তা গিন্নি, বৃথা চিন্তা।"

এমন সময় ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম আনিয়া প্রভুর হস্তে দিয়া দরজার বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় বাহাদুর টেলিগ্রাম পড়িয়া কহিলেন—"মণি তার করচে, গেজেট বের হয়েচে—রজনীর খবরই ঠিক। কিন্তু রজনী বড় কাহিল।"

গৃহিণী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বিস্মিত আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি গো? রজনী কাহিল কি?" তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

মুটবিহারী বাধা দিয়া কহিলেন—"কেঁদ'না—তুমি চোখের জল ফেল্‌লে মেয়ে জামাইয়ের অমঙ্গল হবে।"

"ওগো আমায় কলিকাতায় রেখে এস—আমার প্রাণ ছট্‌ফট করচে। হে মা কালীঘাটের কালী, হে বাবা ধর্ম্মরাজ, বাবা বুড়োরাজ, তোমাদের সাড়ে ষোল আনার পূজো দেব' বাবা—আমার রজনীকে শীগগির নীরোগ করে দাও"—বলিয়া আকুল হইয়া গৃহিণী বারম্বার দেব-দেবীর উদ্দেশে যোড়হস্ত কপালে স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা গৃহিণীকে নানা প্রবোধ দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বিফলকাম হইলেন, তখন অগত্যা কলিকাতা যাওয়াই স্থির হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রক্ত-চাপ (Blood pressure) বাড়িয়া অকস্মাৎ সেদিন কাছারীতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাওয়া অবধি, রজনী শয্যাশায়ী। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোনও ত্রুটি নাই। রোগী বিপন্মুক্ত, তবে বড় দুর্ব্বল!

তিন দিন পরে রায় বাহাদুর ঢাকায় ফিরিয়া গেলেন। গৃহিণী কন্যা জামাতার গৃহে রহিয়া গেলেন; ইচ্ছা—ইহাঁদিগকে লইয়া তিনি একসঙ্গেই ঢাকায় ফিরিবেন; কারণ,—ডাক্তারেরা রজনীকে অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছু দিন বাহিরে অবস্থান করিতে বলিয়াছেন।

এক সপ্তাহ কাটিল। রজনী অনেক সুস্থ! দ্বিপ্রহরে রজনীর ঘরের মেঝেয় সুলতা, গৃহিণী ও রজনীর কন্যা অনুপমা বসিয়া, রজনীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছেন।

গৃহিণী সলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা' এ বিষয়ে মণিকে তুমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে, বাবা?"

রজনী। হাঁ মা; কাল সকালে আমি তাকে হাস্‌তে হাস্‌তে একটু আভাষ দিয়েছিলাম; কিন্তু তাতে সে কোনও উত্তর দেয়নি। তবে তার মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

গৃহিণীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল হঠাৎ মসীময় হইয়া গেল। শ্বশ্রূকে নীরব দেখিয়া রজনী কহিলেন—"দেখুন মা, বাবার যখন এ বিয়েতে অমত তখন আপনি এ নিয়ে বেশী পীড়াপীড়ি কর্‌বেন না। তাতে ফল

ভাল হবে বলে' বোধ হয় না। শেষে এই নিয়ে আপনাদের তিন জনের মধ্যে দুটো ভাগ হবে, আর এতে করে' সংসারে একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি হয়ে উঠবে। তাতে কেউই সুখী হতে পার্‌বে না।"

গৃহিণী অশ্রুভারাবনত নয়নে কহিলেন—"তা'তো বুঝলাম বাবা; কিন্তু আমি দাঁড়াই কোথা? এক দিকে উপযুক্ত ছেলে, অন্য দিকে স্বামী। দুইজনের গোঁ দুই দিকে—আমি কোন্ দিক্ সামলাই? আমার মরণটা হয় তো আমি বাঁচি।"

সুলতা। তুমি একবার মণিকে সব বুঝিয়ে বলে' দেখ না, মা! যদি মত বদ্‌লায়—

রজনী বাধা দিয়া কহিলেন—"তেমন ত মনে হয় না। এ যে বড় মুস্কিল। যে কথা টথা বেশী কয়, তার মনের একটা ঠিকানা মেলে; যে অত্যন্ত অল্পভাষী, তার মনের ভাব বোঝা যে ভগবানেরও অসাধ্য। আমার বিশ্বাস, কম কথা-কওয়া লোক বড় সঙীন্ হয়; তাদের মত ফেরানো দুঃসাধ্য। তবে আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আর আপনি যখন এসে গিয়েচেন তখন আমাদের ছুটি—যা' কর্‌তে হয়, আপনিই করুন।"

গৃহিণী হতাশ ভাবে কহিলেন—"তবেই তো বেশ মুস্কিলে ফেল্‌লে বাবা!" গৃহিণী বুঝিলেন, জামায়ের কথা রক্ষিত না হওয়ায়, অভিমান হইয়াছে।

অনুপমা এই ফাঁকে কহিল—"কৈ, তুমি মামীকে একবার দেখ্‌তে যাবে না, দিদিমা? রোজই বল' যাব; কিন্তু তোমার অবসর আর হয় না বুঝি? এ সবে এত গরিমসী কর্‌লে হয়?"

রজনী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"এ মেয়েটা একটা আস্ত পাগল! গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! কোথায় তোর মামার বিয়ে, যে মামীকে দেখতে যাবি?"

ভাবী বধূকে দেখিতে আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগের কৌতূহল নিতান্ত স্বাভাবিক। গৃহিণীরও মেয়েটিকে দেখিতে খুব ইচ্ছা হইলেও এরূপ স্থির অনিশ্চিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। কিন্তু দৌহিত্রীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি মেয়েটিকে একদিন দেখিয়া তবে ঢাকায় ফিরিবেন, স্থির করিয়াছেন। অনুপমাও তাহার ভাবী মাতুলানীকে দেখে নাই; অথচ তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী টুনী ও বেলার যে সে সৌভাগ্য হইয়াছে, ইহাতে সে তাহার ভগিনীদের কাছে খুবই ছোট হইয়া আছে। কতবার সে তাহার জননীকে বলিয়াছে; কিন্তু সুলতা এই গর্ভিণী কন্যাকে বাহিরে যাইতে দিতে নিতান্ত নারাজ। এখন মাতামহীর অভয় পাইয়া সে একদিনও বিলম্ব করিতে পারিতেছিল না। যতই হউক্, এখনও সে বালিকা—বয়স তো পনর বৎসর।

পিতার শ্লেষ বাক্যে অনুপমা দমিল না। কহিল—"আচ্ছা দিদিমা, আমাদের দেখতেই বা দোষ কি? বিয়ের আগে যে হাজারটা কনে' দেখা হয়, বিয়ে তো একটারই সঙ্গে হয়। আমাদের সব্বারি যদি মেয়ে পছন্দ হয়, তা'হলে আর দাদামণির আপত্তি কিসের। তুমি না পার, বাবা না পারেন,—আমি বল্‌লেই দাদামণি মত দেবেন।"

দৌহিত্রীর সরলতায় গৃহিণী না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না; কহিলেন—"মোগল পাঠান হদ্দ হল' ফার্শী পড়্‌বে তাঁতী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীকে দেখিয়া অবধি গৃহিণীরও ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন নয়—উপর্য্যুপরি চারি পাঁচ দিন রামকমলবাবুর বাড়ী গিয়া, মাধবীকে আদর করিয়া, কোলে বসাইয়া, কত শিখাইয়া কত কল্পনা করিয়া, তাঁহার আশা যেন মিটিতেছিল না।

দ্বিপ্রহরে রামকমলবাবু প্রায়ই বাটীতে থাকিতেন না; কাজেই ভাবী বৈবাহিকার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা তামাসা করিয়া গৃহিণীর দুপুরগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিতে লাগিল। অনুপমাও মনের মত একটি সঙ্গিনী পাইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল; কারণ পিত্রালয়ে আসিলে তাহার সঙ্গী বড় জুটে না। কালেভদ্রে ছাদে উঠিয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ীর দুই একজন মেয়ের সঙ্গে দুই একটি আলাপ করে; কিন্তু তাহাতে কি সাধ মেটে? এখন যে তাহার অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যের বয়স। বাহুল্যই যে যৌবন।

গৃহিণী পরিচয় লইয়া অবগত হইলেন, রামকমলবাবু ইঁহাদের পাল্টা ঘর। ইনি ইতিপূর্ব্বে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; অসহযোগ-নীতির বশবর্ত্তী হইয়া চাকরী ও এম্-এ উপাধিটি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ জন্য, মেনকারাণী স্বামীর উপর অগ্নিশর্ম্মা এবং তাঁহার যে উনচল্লিশ বৎসর বয়সেই দ্বিসপ্ততিতম বৎসর বয়সোপযোগী বুদ্ধি লাভ হইয়াছে, ইহা তিনি সকলকেই যেমন বলিয়া থাকেন, ভাবী বৈবাহিকা ঠাকুরাণীকেও তেমনি জানাইতে ভুলিলেন না।

শিক্ষা কিছুই হয় নাই। সাংসারিক কাজ-কর্ম্মেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিবার সুযোগ হয় নাই; কারণ, জমিদারকন্যার পক্ষে, যাহা চাকর-দাস-দাসীর কর্ত্তব্য, এমন কোনও কার্য্য, জয়গোপালবাবু অত্যন্ত গর্হিত বিবেচনা করিতেন। এমন কি, রামকমলবাবু ডেপুটি হইয়া প্রথম স্ত্রীকে বিদেশে লইয়া যাইতে চাহিলে, জয়গোপালবাবু বড় প্রসন্ন মনে সম্মতি দেন নাই! পরে কন্যাকে সেমিজ পরিতে ও চা পান করিতে দেখিয়া তিনি বিষম চটিয়াছিলেন। তারপর নিরক্ষরা পত্নীকে কিঞ্চিৎ বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট করিবার নিমিত্ত জামাই যখন একজন খৃষ্টান মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন শুনিলেন, তখন আর জয়গোপালবাবু স্থির থাকিতে পারেন নাই। নিশ্চিত জাতিভ্রংশ ঘটিবার আশঙ্কায় কন্যাকে গৃহে আনাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। রামকমল শ্বশুরের ঈদৃশ আচরণে মনে মনে যথেষ্ট ব্যথিত হইলেও, প্রকাশ্যে কোনও প্রতিবাদ করেন নাই—কেবল স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ও শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতার খাতিরে। জয়গোপালবাবু আজ আট বৎসর মারা গিয়াছেন।

মেনকা একটা প্রচণ্ড ঝাঁজের সহিত কহিল—"বল্‌ব আবার কি, দেখতে পাচ্ছ না? শ্যামবাজার থেকে রোজ রায়-বাহাদুর-গিন্নী আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসেন; তুমি নিজে মেয়ের বিয়ের কিছু কর্‌চ না;—অথচ, ভগবান্ যদি একটা সুপাত্র মিলিয়ে দিলেন, তা'ও বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। তিনি ভাব্‌বেন কি? এমন হাবাতে ঘরের মেয়ে যে গায়ে গয়না তো এক টুক্‌রো নেই-ই, পরণে একখানা ভাল কাপড়ও কি জোটে না? ঐ চট পরে' কি লোকজনের সাম্নে মেয়ে বার করা যায়? তাই বল্‌ছিলাম, একজোড়া ভাল দেশী ঢাকাই

কি ফরাশডাঙ্গার শাড়ী, লেস্-বসানো ভাল হ'টো সেমিজ, আর খান দুই ভাল গন্ধ সাবান্ আজ এখুনি এনে দিয়ে তবে বেরিয়ো।"

রামকমলবাবু মাধবীর প্রসারিত দক্ষিণ হস্তস্থিত ডিবার একটি বাটি হইতে কিছু সুপারি মশলা লইয়া মুখে ফেলিয়া দিয়া, কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খদ্দর পর্‌তে কি তোমার বিশেষ কষ্ট হয়, মা? সত্যি বল, তা'হলে অন্য ব্যবস্থা করি।"

মাধবী পিতার প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া কহিল—"না বাবা, কোনও কষ্ট নেই। মা'র কথা শোনেন কেন?"

এই প্রিয়ভাষিণী স্বল্পবাদিনী মাধবীকে নিজের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে রামকমল বাবু বহু দিন হইতে সচেষ্ট। কন্যাও পিতার ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতটি পর্য্যন্ত বুঝিত এবং পিতৃ-ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী হইতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইত।

পিতা-পুত্রীর মনের গোপন কথাটি উভয়েই বুঝিল। রামকমলবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ধীরে ধীরে যথানিয়ম বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মেনকা রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া, দাঁত কড়্মড়্ করিতে করিতে, কহিলেন—"বাপ-সোহাগী মেয়ে, যাও, বাপের কাছেই যাও। মেয়ে যেন দিন দিন ধিঙ্গী হ'য়ে উঠ্‌চেন। আ-মর—'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!' আমি গেলাম ওরই ভাল কর্‌তে, বলি মর্‌চে চট্‌টেনে টেনে; ওমা, আমারই উপর তাল? এইবার হ'তে তুই মরে' গেলেও আর আমি তোর জন্যে কিছু বল্‌ব না, বল্‌ব না, বল্‌ব না—এই তিন সত্যি কর্‌লাম।"

মাধবী মায়ের রাগ জানিত। এ প্রকার তিলকে তাল পাকাইয়া

প্রগাঢ় দাম্পত্য-প্রেমালাপ পিতামাতায় সাক্ষাৎ হইলেই হইত; এবং শেষে গদাঘাতটা গিয়া মাধবীর উপরেই পড়িত। মাধবী ইহাতে বহুদিন হইতেই অভ্যস্ত।

ঘণ্টাখানেক কাল নানা অকারণ সকারণ স্বগত খেদোক্তি করিয়া মেনকা দালানে আসিয়া বসিতেই, দুয়ারে ঘোড়ার গাড়ী থামার শব্দ হইল।

"কই গো, বেয়ান্ কোথায়" বলিয়া রায়বাহাদুর-গৃহিণী, সুলতা ও অনুপমার সঙ্গে, সহাস্যমুখে পান চিবাইতে চিবাইতে উঠানে আসিয়া দাড়াইতেই, মেনকা তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া দরদালানে লইয়া গিয়া বসাইল।

গৃহিণী কহিলেন—"আজ আমরা রাত্রের গাড়ীতে ঢাকা যাচ্ছি, ভাই; বেশীক্ষণ আজ আর বস্‌তে পার্‌ব না। এক্ষুনি যাব।"

মেনকা পানের ডিবা ও জর্দ্দার কৌটাটি আগাইয়া দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, হঠাৎ?"

গৃহিণী মুখে পান দিতে দিতে উত্তর করিলেন—"হঠাৎ কোথা, ভাই? রজনীর শরীর খারাপ, তাকে নিয়ে যাবার জন্যেই তো আমি বসে'। এতদিনে বাবাজীর হাতের কাজ ফুরুলো বলে' আজই যাচ্ছি। ওদিকে তোমার বেয়াইয়েরও তো অনেক অসুবিধা হচ্ছে।"—

মেনকা "তা' বটে" বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কহিল— "আপনি ছেলের মা হয়ে এত দিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিলেন; আর আমি মেয়ের মা, একদিনও আপনার কাছে যাবার অবকাশ কর্‌তে পার্‌লাম না। যে আমাদের বাড়ীর লোক! এই দেখুন না—এই আমাদের খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে—"

গৃহিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"এতে আর 'কিন্তু' কি বোন্? তুমি একা মানুষ, ছেলে পিলে নিয়ে ফুর্‌সুৎ কর্‌তে পার না, যাও না ;—আমার কাজকর্ম্ম নেই, আমি আসি। এতে আর লজ্জা কি ?"

মেনকা আপ্যায়িত হইল; তাহার মনে একটা খট্‌কা বাজিত, সেটা গৃহিণীর সহৃদয়তায় নিঃশেষে বিনষ্ট হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"বেয়াই মশায়ের পত্র পেলেন ? তিনি মত করেচেন ?"

গৃহিণী সতেজে কহিলেন—"না, এ সম্বন্ধে কিছুই তিনি লেখেন নি, তবে, তোমার মেয়েকে আমি নেবই, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

মাথার উপরে টিকৃটিকী শব্দ করিল। মেনকা ও গৃহিণী উভয়েই মাটিতে তিনটি টোকা দিয়া হাতটি কপালে ঠেকাইলেন। মেনকা কহিল, "সত্যি সত্যি। তবে দু'টোর হাত যতক্ষণ না এক হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই বলা যায় না, বেয়ান! প্রজাপতির ইচ্ছে—তিনি যা' করেন—" সুলতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

গৃহিণী ডাকিলেন—"মাধবী, কোথায় গেলে মা ? একবারটি এখানে এসতো !"

কক্ষান্তরে মাধবী ও অনুপমা গল্প করিতেছিল, গৃহিণীর ডাক শুনিবামাত্র দুইজনেই দরদালানে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহিণী কহিলেন—"এস মা, এইখানে একটু বস !" বলিয়া নিজের দক্ষিণ দিকের স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। মাধবী আস্তে আস্তে সেইখানে গিয়া বসিল।

"কবে যে আমার ঘরে আস্‌বে মা, তাই হয়েচে আমার এখন দিবারাত্রের চিন্তা" বলিতে বলিতে গৃহিণী তোয়ালে-জড়ানো একটা

পুঁটুলি হইতে একটি ঝক্‌ঝকে চাম্‌ড়ার কৌটা বাহির করিলেন ; সেটি খুলিয়া একগাছি হীরকখচিত নেক্‌লেস বাহির করিয়া, মাধবীর গলায় পরাইয়া দিয়া, সস্নেহে ভাবী পুত্রবধূকে চুম্বন করিলেন।

মাধবী প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। একটু সাম্‌লাইয়া প্রগাঢ় ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ভাবী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

মেনকা অবাক্ হইয়া এই সব দেখিতেছিল ; তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা ফুটিতেছিল না।

সুলতা মাতা-পুত্রীর আচ্ছন্ন ভাবটা ভাঙাইবার জন্য পরিহাস করিল —"আচ্ছা, মাধবী, তুই কি বেইমান্! আমি হচ্ছি তোর বড় ননদ, আর আমাকে তোর গেরাহ্যি হচ্ছে না? দাঁড়া—" বলিয়া সজোরে তাহার সুগৌর মসৃণ গণ্ড দুইটী টিপিয়া দিয়া রক্ত-গোলাপের মত রাঙাইয়া দিল। মাধবী সুখের আবেশে এবং লজ্জার আতিশয্যে মন্ত্রচালিতের ন্যায় ননদিনীর পাদবন্দনা করিল। সুলতা মাধবীকে কোলে টানিয়া লইল। মাধবীর কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা ফুটিয়া উঠিল ; ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব বিলুপ্ত হইল, এই বিশ্ব-সংসার সব মুছিয়া গেল। অসহ্য পুলকে কুমারী মাধবী তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল,—জগতে মণীশ ও সে—শুধু দুইজন আর কেহ নয়!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় আটটা। মেনকা মেয়েদিগকে খাওয়াইয়া দরদালানে রামকমলবাবুর খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া কলতলায় হাত-পা ধুইতেছে, —এমন সময় অর্গলাবদ্ধ বহির্দ্বারে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। মেনকা কিয়ৎক্ষণ কাণখাড়া করিয়া শুনিয়া বুঝিল যে, তাহাদের দরজার কড়াই কে নাড়িতেছে, অথচ কোনও কণ্ঠস্বর নাই। চঞ্চল হইয়া সে আট বছরের কন্যা বেলাকে সঙ্গে করিয়া দুয়ার-গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

দুয়ার না খুলিয়াই বেলা জিজ্ঞাসা করিল—"কে কড়া নাড়্‌চে?"

মৃদুস্বরে উত্তর হইল—"আমি, বেলা, আমি—মণীশ।"

দড়াম্‌ করিয়া খিল্‌ খুলিয়াই বেলা কহিল—"মণিবাবু, আমি মনে করি কোনও চোর বুঝি!"

মেনকা ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল—"এস বাবা, বাড়ীর মধ্যে এস, বাইরে কেন? বাড়ীর সব খবর ভাল তো?"

মণীশ যেখানে ছিল সেইখানে দাঁড়াইয়াই উত্তর দিল—"না, আমি আর ভিতরে যাব না।—"

বাধা দিয়া বেলা জিজ্ঞাসা করিল—"এই ঠাণ্ডায় আপনি খালি পায়ে যে, মণিবাবু?"

মণীশ তাহাকে কোনও উত্তর না দিয়া, ভারী গলায় নেপথ্যবর্ত্তিনী

ভাবী শ্বাশুড়ীকে জানাইল যে, আজ চারি দিন হইল তাহার জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

"য়্যাঁ! বেয়ান্ নেই! সে কি গো?" বলিয়াই মেনকা কাঁদিয়া ফেলিল। দেখাদেখি বেলার চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

মণীশ কহিল—"আমি এখনি চল্লুম। দিদিদের নিয়ে এই রাত্রেই আমি ঢাকা যাচ্ছি। আপনাদের তাই সংবাদ দিতে এসেছিলুম মাত্র।"

আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মণীশ ধীর পদক্ষেপে চলিয়া গেল, মেনকা দরজার বাহিরে আসিয়া সাশ্রুনয়নে মণীশের গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। চুল রুক্ষ, খালি পা, গায়ে একখানা শাল জড়ানো, মাতৃহীন মণীশ আস্তে আস্তে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

মেনকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে দুয়ারে খিল দিয়া গলদশ্রু লোচনে দরদালানে আসিয়া বসিলেন। মাধবী জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল মা, কাঁদচ কেন?"

মেনকা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বেলা কহিল—"মণিবাবুর মা আজ চার দিন হ'ল মারা গেছেন। তাঁরা আজ সবাই ঢাকা যাচ্ছেন, তাই মণিবাবু বল্‌তে এসেছিলেন।"

মাধবী দাঁড়াইয়া ছিল, ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। অন্য ভগিনী দুইটি শুইয়াছিল, তাহারা লেপ ছাড়িয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। সকলেই নীরব। মাধবীর মুখখানা হঠাৎ কাগজের মত শাদা রক্তহীন হইয়া গিয়াছিল; তাহার অন্তরে বেদনার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল।

বহুক্ষণ যাবৎ মৃতার গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার বাঞ্ছিত সতীলোক-প্রাপ্তির সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিতে করিতে, অকস্মাৎ মেনকার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়া, কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিল। কহিল—"এ খণ্ড-কপালে মেয়ের অদেষ্টে এমন ঘর-বর সইবে কেন? এমন ছেলে, এমন বংশ, লোকে লক্ষ টাকা দিয়ে পায় না; তা এ রাক্কুসীর জুটল—আর অমনি শ্বাশুড়ীকে একবারে ডব্ করে খেয়ে ফেল্‌লি?"

বলিয়া নিজের হাত দুইখানি আপনার মুখের কাছে লইয়া গিয়া, তাড়াতাড়ি মুখবন্ধ করিয়া কন্যার শ্বাশুড়ী-ভক্ষণের অনুকরণ করিয়া, কহিল—"এইবার থাক্, আবার গুব্‌ড়ো হয়ে আরেক বছর! আর, একবছর বাদ কি আর রায়বাহাদুর এই অপয়া মেয়েকে নেবেন? কখ্‌খনো না! আ মর্! ছুঁড়ীকে দেখ্‌লে আমার গা সুদ্ধ জ্বলে যায়।"

মাতার গাত্রদাহ নিবারণ-কল্পেই হউক, অথবা আত্মরক্ষার্থেই হউক্, মাধবী ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল, ঘড়িতে বাজিল এগারটা।

রামকমলবাবু বাড়ী ফিরিলেন। মাধবী দরজা খুলিয়া দিতেই, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এগারটা বাজে, তবু তুমি শোওনি' যে মা?"

মাধবী মৃদুস্বরে কহিল—"যাই, এইবার শুইগে।"

ঘরে ঢুকিয়াই শ্রাবণের সজল মেঘভারাবনত গম্ভীর আকাশের মত পত্নীর মুখমণ্ডল দেখিয়া, রামকমলবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, আজ ব্যাপারটা কি? এত রাত্রি অবধি বাড়ীসুদ্ধ সবাই যে জেগে বসে'—ব্যাপার কি?"

মেনকা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ব্যাপার আর কি? তোমার বড় মেয়ের বিয়ে।"

রামকমল বাবু নীরব, হতভম্ব! মাধবীর মুখ পানে চাহিতেই, সে সরিয়া গেল।

মেনকা কহিতে লাগিলেন—"মণির মা আজ চার দিন হ'ল মারা গেছেন যে? সে খবর কিছু কি রাখ?—"

রামকমলবাবু সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া কহিলেন—"তাই না কি? বড়ই দুঃখের কথা—আহা, ছেলেমানুষ, এই বয়সে মাতৃহীন হল? মণি কি খুব কাতর হয়েচে? তুমি কি রজনীবাবুদের বাড়ী গেছলে না কি?"

মেনকা ঝাঁজের সহিত কহিলেন, "আমি কি সে ভাগ্যি করেচি যে কোথাও একদণ্ড বেরুব? তাহলে দুবেলা এমন হাঁড়ি ঠেল্‌বে কে? মণি এসেছিল, বলে গেল! এখন কি কর্‌বে, কর! এক বছরের মধ্যে তো আর বিয়ে হচ্ছে না। কোনও রকমে যদিও একটা ভাল সম্বন্ধ হল, তা'ও কপাল-গুণে পণ্ড হয়ে গেল। মেয়ে যে ষোলয় পড়ল! হুঁস্ আছে?"

রামকমলবাবু শান্তভাবে কহিলেন—"মেয়ে ষোলয় পড়ল কি সতেরয় পড়ল, আমি তা ভাবচি না—আমি ভাবচি, মণির কথা।"

মেনকা হাত পা ছুঁড়িয়া মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"না, তা ভাববে কেন? কল্‌কাতায় তো আর সমাজ নাই, থাক্‌লে বুঝতে! আমাদের দেশ হলে ধোবা নাপিত বন্ধ হয়ে, একঘরে করে' কোন্ দিন তোমায় ঠেল্‌ত! ধন্যি তুমি বাপ যা' হোক্—বিশ বছুরে মেয়ে ঘরে, তোমার গলা দিয়ে ভাত নামে কি করে?—"

রামকমলবাবু কঠোর স্বরে কহিলেন—"দেখ, তোমার ব্যবহার দিন দিন এমন বিশ্রী হচ্ছে যে, তোমায় ভদ্রমহিলা মনে কর্‌তেও অপমান

বোধ হয়। নিজের অসভ্যতার দরুণ তুমি এ সংসারের শান্তি, শৃঙ্খলা, শিক্ষা সব নষ্ট করেচ। তোমার মত স্ত্রীর মুখদর্শন কর্‌লে পর্য্যন্ত পাপ হয়। তুমি থাক্‌তে এ বাড়ীর আর মঙ্গল নাই।"

আজ প্রায় বিশ বৎসর কাল মেনকা স্বামীর সংসার ও তাঁহার সঙ্গে কলহ করিতেছেন, কিন্তু ঈদৃশ পরুষ কণ্ঠ ও ভাষা কখনও শোনেন নাই। কাজেই প্রথমটা তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

রামকমল শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া চুপচাপ বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

মাধবী আস্তে আস্তে পিতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, শুয়ে পড়লেন যে? উঠুন্, খাবেন।"

রামকমল লেপের ভিতর হইতেই উত্তর করিলেন—"শরীরটা ভাল নেই, মা, আজ আর খাব না।"

মাধবী ইহা পিতার ছল মনে করিয়া, লেপের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়া পিতার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল, ভয়ানক উত্তপ্ত। মাধবী সবিস্ময়ে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"ও মা, তাই ত! এ যে জ্বরে গা' পুড়ে যাচ্ছে, বাবা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পত্নীবিয়োগের পর রায়বাহাদুর কলিকাতায় বদ্‌লি হইলেন। ভবানীপুরে একখানি অতিক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়া, নুটবিহারীবাবু একটি মাত্র ভৃত্য লইয়া নূতন সংসার স্থাপন করিলেন। এক বেলা নিজে রাঁধিয়া হবিষ্যান্ন করেন, রাত্রে ফলমূলাদি খান। অবসরকাল পূজা, জপ ও হরিনাম করিয়া কাটান।

মাত্র তিন মাস কাল পত্নীবিয়োগ হইয়াছে; ইতিমধ্যে রায়বাহাদুরের শয়নকক্ষে দুইখানি ও বসিবার কক্ষে একখানি গৃহিণীর এন্‌লার্জমেণ্ট ঝুলিয়াছে। একেই তো তিনি নিষ্ঠাবান্ গোঁড়া ব্রাহ্মণ; তদুপরি ঈদৃশ বিপত্নীক অবস্থায়, তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। হবিষ্যান্ন, স্বপাক, কম্বল আসনে উপবেশন, মৃগচর্ম্মে শয়ন, আহারান্তে হরিতকী চর্ব্বণ, নিত্য গঙ্গাস্নান, সর্ব্বদা নামাবলীর আবরণ, কণ্ঠে বাহুতে রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ—কোনও আয়োজনেরই ত্রুটি রহিল না। পিতার এতাদৃশ বৈরাগ্যে ও ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতায় কন্যা জামাতা আত্মীয় বন্ধু সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

কন্যা সুলতা রজনীর সহিত, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়; রায়বাহাদুরের সায়ংসন্ধ্যায় বসিতে বেশী বিলম্ব নাই।

সুলতা কহিল—"না বাবা, তা' হতে পারে না। এমন করলে শরীর টি কবে কেন? আপনার কি এত সহ্য হবে, এই বুড়ো বয়সে?"

পিতা কতক প্রসন্ন কতক বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন—"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। বামুণের বিধবাদের সয় কি করে? আর, বুড়োমানুষই তো, না সইলেই বা তোমাদের কি ক্ষতিবৃদ্ধি?"

শেষের কথাগুলিতে যে প্রচ্ছন্ন ঝাঁজটুকু ছিল, সুলতা ও রজনী উভয়েই তাহা লক্ষ্য করিল। পত্নীকে বিব্রত দেখিয়া, রজনী কহিল—"আপনার শরীরের ভাল-মন্দতে আমাদের ছাড়া আর কার বেশী লাভ-লোকসান্, বাবা? এই যে মা গেলেন, এ তো আমাদেরই গেলেন!"

নুটবিহারী কহিলেন—"আর বাবা, সংসারের সব সুখই ত' ভোগ করলাম; পরমেশ্বর আমায় কিছুই কম করে দেন নি! তবে ভেবেছিলাম, শেষটা শান্তিতে বাবা বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে আশ্রয় নেব—সেইটে ঠিক হল না! গিন্নি পুণ্যবতী ছিলেন, স্বর্গে চলে গেলেন—তারা, তোমারি ইচ্ছা মা—"

সুলতার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল—"তা'হলে কাশী যাওয়া কি আপনার একরকম ঠিকই, বাবা?"

রায়বাহাদুর উত্তর দিলেন—"হাঁ মা, আমার সব বন্দোবস্তই ঠিক, কেবল টিকিট করে গাড়ীতে চড়লেই হয়। দেরী কেবল যা আমার বেরুতে। পৃথিবীতে শুভকার্য্যে বিঘ্ন তো বড় কম হয় না? এখন আমার পেন্সনটা মঞ্জুর হওয়া আর মণির বিয়েটা দিলেই ব্যস, আমার সংসার থেকে একেবারে ছুটি।"

আসন্ন বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় কন্যা ও জামাতা উভয়েই মুহ্যমান্ হইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে কাটিল। রজনী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে

জিজ্ঞাসা করিল—"তা'হলে, কালই বিকেলে রামকমলবাবুর মেয়েটিকে দেখতে যাওয়া ঠিক ত?"

রায় বাহাদুর। হাঁ নিশ্চয়ই। তোমার শাশুড়ীর বড্ড যখন ইচ্ছে ছিল, তখন একবার মেয়েটিকে দেখাই যাক্। তিনি যেমন ঝোঁক ধরেছিলেন, তা'তে বেঁচে থাকলে, এই মাঘ মাসে তো বিয়ে দিতেই হ'ত। এখন অবিশ্যি একবছর তো আর বিয়ে হচ্ছে না!"

স্থলতা সজলনেত্র মুছিতে মুছিতে কহিল—"হাঁ বাবা, বছর ঘোরা মাত্রই যেন বিয়েটা হয়। মা আমার এই মেয়েটিকে আমাদের ঘরে আন্‌তে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে গেছেন। তাঁর এ ইচ্ছাটা যেন পূর্ণ হয়। আর, রামকমলবাবু মারা গিয়ে অবধি ওদের বড্ড কষ্ট হয়েচে, অথচ চারচারটি আইবুড়ো মেয়ে গলায়—বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বন্ধক; কি করে যে কি হবে, তা' ভগবানই জানেন।"

রায়বাহাদুর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"দেখি। তা'হলে এইবার উঠলাম আমি, আমার সন্ধ্যার সময় হল।"

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভয়ানক গুমোট। বেলা প্রায় চারিটা। গলিতে কুল্‌ফী বরফ হাঁকিয়া গেল; পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিষণভোগ, ল্যাংড়া, ফজলী আমওয়ালাও বিচিত্র স্বরে ডাকিয়া গেল। মাধবী দালানে ভগিনী তিনটিকে অঙ্ক কষাইতেছিল। মেনকা বারান্দায় বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল।

অকস্মাৎ খোলা দরজা ঠেলিয়া সুলতা ও অনুপমাকে প্রাঙ্গণমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, মেনকার তন্ময় চিন্তা বাধা পাইল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তভাবে "এস মা, এস, এস"—বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন। মেয়েরাও বইশ্লেট ফেলিয়া একবারে উঠানে আসিয়া হাজির হইল।

অনুপমা কহিল—"বাবা আর দাদামশায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁরা মেয়ে দেখতে এসেচেন।"

"ও মা, তাই নাকি? ওলো যূথি, শেফা, ও বেলি মুখপুড়ী—ও মাধবী—" বলিয়া মেনকাকে সন্ত্রস্তভাবে কম্পিত চরণে হাঁকডাক ছুটোছুটি করিতে দেখিয়া, সুলতা কহিল—"আপনি কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না, মা—আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

মেনকার উত্তেজনা কিছুমাত্র কমিল না। অসম্বদ্ধ ভাবে কহিলেন —"তা কি করে হবে—মা—তা—"

সুলতা বুদ্ধিমতী, সে এ চাঞ্চল্যের কারণ বুঝিয়াছিল, কহিল—"আপনি স্থির হয়ে বসুন্ দেখি, মা! অনু বাবাকে ডাক্। এই যে মাদুর পাতাই আছে।" মাধবী ইতিমধ্যে রান্নাঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

রজনী ও নুটবিহারীবাবু আসিতেই, সুলতা কহিল—"বসুন বাবা, এখানে বসুন। মাধবী কোথায় লুকোলি, আয় বেরিয়ে আয় শীগ্‌গির।"

মাধবী আসিল না। সুলতা রান্নাঘরে ঢুকিয়া আড়ষ্ট বিহ্বল মাধবীকে গলবেষ্টন করিয়া আনিয়া পিতা ও স্বামীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া, কহিল—"এইখানে বাবার কাছে বস! লজ্জা কি?"

মাধবী উভয়কে প্রণাম করিয়া শ্বশুরের পার্শ্বে লজ্জায় জড়সড় হইয়া

বসিয়া ঘামিতে লাগিল। গোধূলির রক্তিম আকাশের নীচে তাহার মুখখানি সন্ধ্যামণির মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

মোটা আধময়লা খদ্দরের শেমিজ ও শাড়ী-পরিহিতা নিরাভরণা এই গৌরীকে দেখিয়া রায়বাহাদুরের চক্ষু আর ফিরিতে চাহে না। আকর্ণ-বিশ্রান্ত বড় বড় ঢলঢলে চক্ষু দুইটি ভাবাবেশে কেবলি মুদিয়া আসিতেছিল; বিপুল অজগরের মত অবেণীসম্বদ্ধ চিক্কণ কালো কেশদামভারে পৃষ্ঠদেশ যেন পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল; সমুন্নত সরল নাসিকার রন্ধ্রপথে লজ্জা ফুঁসিতেছিল—কি অপরূপ! কি সুন্দরী এই কন্যা! রায়বাহাদুর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন—হাতের আঙুল, পায়ের পাতা, মুখের বিবর—কোথাও কোনোও খুঁৎ নাই! তিনি মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"তোমার নামটি কি?"

মৃদু অথচ মধুর সেই লজ্জাভারাবনম্র অধর-যুগল ভিন্ন হইয়া শব্দ হইল—"মাধবী দেবী।"

"এখন কি পড়?

"কুমার-সম্ভব মেঘনাদবধ, Palgrave, Helps Essays, আর পারিবারিক প্রবন্ধ।"

"রান্না-বান্না জান?"

মাধবী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, জানে।

সুলতা দালান ও বারান্দার মধ্যবর্ত্তী দুয়ারের মাঝে দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল—"আজকাল মাধবীই তো রান্না করে—মা তো আঁস ছোঁন না!"

"আচ্ছা যাও, ঘরে যাও, বড় লজ্জা লাগচে—কেমন?" বলিয়া

রায়বাহাদুর মাধবীকে বিদায় দিলেন। সে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। রায়বাহাদুর তাহার গমন-ভঙ্গিটিও নিরীক্ষণ করিতে ছাড়িলেন না।

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কন্যার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"জিজ্ঞাসা কর তো মা, মেয়ের কোনও টিকুজী-কোষ্ঠী আছে কি না?"

সুলতা একবার ভিতরে চাহিয়া, উত্তর দিল—"আছে, আপনি চান্?"

রায়বাহাদুর কহিলেন—"হাঁ, চাই বই কি? আমায় একবার সেখানা দিতে বল, মা! মিলিয়ে দেখতে হবে—"

বলিয়া রজনীর মুখে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। রজনী শ্বশুরের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া কহিল—"নিশ্চয়। এই মিলই তো আসল মিল।"

সুলতা একখানা আধময়লা ন্যাকড়ায় জড়ানো গোলাকার লম্বা একটা পদার্থ আনিয়া পিতার হাতে দিল; পিতা সেটি পকেটে পুরিলেন।

রজনী জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়ে কেমন দেখলেন।"

রায়বাহাদুর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ সামলাইয়া লইয়া কহিলেন—"মেয়ে বেশ, তা'তে আর সন্দেহ কি? তবে এইবার ওঠা যাক্"—বলিয়া রায়বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইতেই, রজনীও শ্বশুরের অনুকরণ করিয়া কহিল—"হাঁ চলুন। অনু, এস মা—তোমার ছেলে হয়ত কাঁদচে এতক্ষণ।"

নিষ্ক্রমমান পিতা ও স্বামীর পিছু পিছু আসিতে আসিতে সুলতা

কহিল—"মা দুঃখ কর্‌চেন্ যে, একটু মিষ্টি মুখ না করে' যেতে নাই। কোনও খবর না দিয়ে আসার জন্যে তিনি কিছু বন্দোবস্ত করতে পারেন নাই—"

রায়বাহাদুর বহির্দ্বারে আসিয়া একটু দাঁড়াইয়া কহিলেন—"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না! পরে কত খাব'—ভাবনা কি? তোমরা এস মা—অনু কৈ?"

অনু তখনও মাধবীর সঙ্গে গৃহকোণে গল্প করিতেছিল। রজনী ডাকিল—"অনু—অনু—"

দ্বারান্তরালে সরোদনে নাতিনিম্নস্বরে মেনকা সুলতাকে বলিতেছিলেন—"তুমি তো সবই জান মা, তাঁর অসুখের সময় সব বেচেও যখন কুলুতে পার্‌লাম না, তখন ভদ্রাসনখানা পর্য্যন্ত বাঁধা দিতে হ'ল। এখন আমাদের দু'মুঠো পেটের ভাতের সংস্থান পর্য্যন্ত নেই—তার উপর এই চার চারটে আইবুড়ো মেয়ে!..."

রায়বাহাদুরও কথাগুলি সব শুনিলেন; কিন্তু কোনও উত্তর না দিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাস। সকালে ছোট এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা।

মণীশ ঢাকায় প্রোবেশনারী পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। মুখ্য উদ্দেশ্য—পিতা পেন্সন্ লইয়া কাশীবাস করিতে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা। সুলতা ও মণীশ রায়বাহাদুরের ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, পিতা পার্শ্বোপবিষ্ট একজন কুদর্শন লোকের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা কহিতেছেন :

লোকটির পরিধানে আধময়লা একখানা থান ধুতি, গায়ে ঘর্ম্মসিক্ত স্থানে স্থানে সোঁদালাগা ততোধিক অপরিস্কার তালি-দেওয়া একটা শার্ট, হাতে বোতাম নাই, সুতা দিয়া বাঁধা ; গলায় একখানা ময়লা কোঁচান চাদর ; পায়ে ধূলি-মলিন একজোড়া চটি জুতা—সেটা কালো কি কটা চামড়ার তাহা ধূলার ভারে বোঝা যায় না ; পাশে একটা ভাঙা ছাতা। লোকটার কাঁচাপাকা চুল ; ছয় দিন মুখে ক্ষুর পড়ে নাই। কপাল রেখা-বহুল। চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র ও বর্ত্তুলাকার ; তাহাতে দস্তার ফ্রেমের একখান চস্‌মা। অধরোষ্ঠ পাতলা। ক্ষীণ কৃশ তনু ; দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীতে রূপার তারের দুইটি আংটি ; মাথায় একটা হৃষ্টপুষ্ট শিখা। কপালে শ্বেতচন্দনের একটি ফোঁটা।

অপ্রত্যাশিত ভাবে অসময়ে কন্যা ও পুত্রকে দেখিয়া রায়বাহাদুর যেন কোনও কুকার্য্যে হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন, এমনি ভাবে চমকিয়া উঠিলেন ; তাঁহার মুখ রক্তহীন হইয়া উঠিল। কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া ঐ লোকটিকে কহিলেন—"আচ্ছা, আপনি তা'হলে এখন আসুন্। অন্য সময়ে আস্‌বেন।"

আগন্তুক "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিল। সুলতা এতক্ষণ তাহার পানে সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়াছিল, কহিল—"এ কে বাবা ?"

রায়বাহাদুর কন্যার কথা যেন শুনিতেই পাইলেন না, পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে মণি, তুই যে হঠাৎ ? কখন এলি ?"

মণীশ সবিনয়ে নতমুখে উত্তর দিল—"এই আজই সকালে।"

সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—"কবে আপনার যাত্রার দিন করলেন বাবা ?"

রায়বাহাদুর উত্তর দিলেন—"১২ই শ্রাবণ। এখনও প্রায় এক মাস বাকী।"

মাতার শোকে পিতা যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছিলেন, তাহাতেই কন্যার দুঃখের সীমা ছিল না। তাহার উপর এই বার্দ্ধক্যে পেন্সন লইয়া একাকী তিনি যে চির জীবনের মত কাশীবাস করিতে চলিয়াছেন, তাহাতে সুলতা আর অশ্রুবেগ দমন করিতে পারিল না। সে ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রায়বাহাদুরের মুখে এতক্ষণ যে একটা অপ্রসন্নতার মেঘ লুকোচুরি খেলিতেছিল, সেটা এইবার নিঃশেষে কাটিয়া গেল। তিনি কন্যাকে বহু সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়া, সংসারের অনিত্যতা, জীবনের ক্ষণ-স্থায়িত্ব, মায়া

পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ, পরকাল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ে এক নিঃশ্বাসে বহু উপদেশ দিয়া নিজের পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়া, হাঁপাইয়া পড়িলেন।

বেলা দশটা বাজে। পিতাকে ইহার পর স্নানাহ্নিক করিয়া স্বয়ং রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে জানিয়া, সুলতা উঠিল।

রায়বাহাদুর মণীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সময় বেশী অনুপস্থিত থাক্‌লে কাজকর্ম্ম শিখতে পার্‌বে না, পরীক্ষায় ক্ষতি হইবে; মনে থাকে যেন, আমি আর নাই; এখন থেকে তোমায় নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াতে হবে। 'আগে পাশ কর, কাজে পাকা হয়ে বস', তারপর অন্যদিকে মন দিও।" কণ্ঠস্বর কঠোর।

মণীশ নীরব; টেবিলস্থিত গীতাখানির যেমন পাতা উল্টাইতেছিল, তেমনিই পাতা উল্টাইতে লাগিল।

সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, ঠিকুজীর মিল হ'ল?"

রায়বাহাদুর উত্তর করিলেন—"না, এখনও জান্‌তে পারি নি। যেখানে দিয়ে এসেচি, সেখানে আর যাওয়াও হয় নাই।"

সুলতা কহিল—"সেখানে একবার অবসর-মত যাবেন আজই তা'হলে বাবা—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নুটবিহারী বলিলেন—"হাঁ যাব। (মণীশের প্রতি) এবার তোমার মহাগুরুনিপাতের বছর। তুমি তাঁর একমাত্র উপযুক্ত পুত্র, তোমার উচিত—একটা বৎসরও অন্ততঃ হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী সংযমী হয়ে থাকা। কোনও রকম অনুচিত চিন্তা করা এ সময় তোমার মোটেই কর্ত্তব্য নয়।" স্বর তিক্ত ও স্নেহহীন।

মণীশ পিতৃবাক্যের নিগূঢ় শ্লেষটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। স্নলতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বিরক্তি গোপন করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। মণীশ ও দিদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবতরণ করিল। রায়বাহাদুর ব্রহ্মচর্য্যের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইলেন।

বেলা প্রায় চারিটা। দরদালানে স্নলতা দৌহিত্রকে কোলে করিয়া আদর করিতেছে। অনুপমা পাশের বাড়ীতে বধূর সঙ্গে তাস খেলিতে গিয়াছে। পাশের ঘরের দুয়ারে মণীশ ও রজনী দুইখানি চেয়ারে বসিয়া নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত।

সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া সকলেই আলাপ বন্ধ করিয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিল। অকস্মাৎ বেলার সঙ্গে মেনকাকে দেখিয়া স্নলতা যুগপৎ চমৎকৃত ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অভ্যর্থনা করিয়া—"আসুন্, আসুন্ মা, কি ভাগ্যি—আপনার পায়ের ধূলো—"

মেনকাকে প্রণাম করিয়া, বেলাকে আদর করিয়া স্নলতা আসন পাতিয়া বসাইল।

মেনকা কহিল—"মা, বড় বিপদে পড়ে এসেচি! বেইমশাই পরশু মাধবীর ঠিকুজী ফেরৎ দিয়ে ঘটক ঠাকুরকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে, মণির সঙ্গে কিছুই মেলে নাই; এমন কি, এ বিয়ে হ'লে তিন মাসের মধ্যেই নাকি মাধবীর কপাল পুড়্বে। তাই তিনি এ সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েচেন। এখন কি করি মা—"

মেনকা কাঁদিয়া আকুল হইল। স্নলতা এ সংবাদে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল; কারণ, আজ প্রাতেই সে তার পিতার নিকট শুনিয়াছে যে, ঠিকুজী এখনও জ্যোতিষীর কাছ হইতে

ফেরৎ পর্য্যন্ত আনা হয় নাই, কাজেই মিল হইয়াছে কিনা তাহাও জানা যায় নাই, অথচ এ কি ? তবে কি পিতা মিথ্যা বলিয়াছেন ? সুলতার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। রজনী ও মণীশ এ সংবাদে একেবারে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল, কি যে বলিবে, ঠিক করিতে পারিল না।

কিয়ৎকাল সকলেই নির্ব্বাক্। রজনী দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ঠিকুজীখানা ঠিক ফেরৎ পেয়েছেন ত ?"

মেনকা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে উত্তর দিল—"হাঁ বাবা, পরশু ঘটক এসে দিয়ে গেছে ; এই দেখ' এনেচি। যদি কোনও ভাল জ্যোতিষীকে তুমি দেখাতে চাও তো একবার দেখিয়ো !"

সুলতার চক্ষু-দুটি দুঃখে ও সমবেদনায় যেমন ভরিয়া উঠিল, পিতার এই মিথ্যা কথাটার জন্য তেমনি তাহার পিতৃ-ভক্তিপরায়ণ মনটাও পিতার উপর অত্যন্ত বিমুখ ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সুলতা ভাবিতেছিল, তাহার স্বর্গগতা জননীর প্রতিজ্ঞা, কনিষ্ঠের একান্ত আগ্রহ ও একমাত্র প্রণয়াস্পদকে না পাওয়ার জন্য মর্ম্মভেদী বেদনা এবং মাধবীর ন্যায় লক্ষ্মী-প্রতিমাকে ভ্রাতৃবধূরূপে পাইয়া হারানোর কথা ! সে যে কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

মেনকা গলাটা সাফ্ করিয়া লইয়া কহিল—"আমি গরীব, বেইমশায় বড়-লোক—তাই তিনি চালাকী ক'রে এ সম্বন্ধটা ভেঙে দিলেন, মা ! কারণ, তিনি ভেবেচেন্, তাঁর একটি ছেলে—ছেলের বিয়েতে সাধ আহ্লাদ হবে না। তা' সোজা বল্‌লেই ত হ'ত ! বেয়ানের

মুখেও শুনেছি ত—তাঁর খুব মত থাকলেও বেই-মশায়ের এ সম্বন্ধে গোড়াগুড়িই অমত। আমার ভাগ্যে নেই—"

মেনকা আর বলিতে পারিল না। দুঃখে ও হতাশায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুলতা পিতার ঈদৃশ রহস্যপূর্ণ ব্যবহারে কেবল যে বিস্মিত হইয়াছিল তাহা নহে, মনে মনে বাস্তবিকই চটিয়াছিল। তবু পিতৃনিন্দায় সুলতা একটা উচ্চ প্রতিবাদ না করিয়া পারিল না; কহিল—"এতে বাবা আপনার সঙ্গে চালাকী কি কল্লেন, মা? যদি ঠিকুজী কোষ্ঠীর মিল না হয়, তাহ'লেও কি আপনি এ বিয়ে দিতে চান? বাবা যেমন ছেলের দিকে চাইচেন, আপনারও তেমনি মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে চাওয়া উচিত তো? শুধু মেয়েকে কোনও রকমে একটা বিয়ে দিয়ে বিদেয় কর্‌তে পারলেই তো বাপ মায়ের কর্ত্তব্য শেষ হয় না?"

মেনকা অশ্রু মুছিয়া ধরা-গলায় কহিল—"লক্ষ্মী মা আমার, আমার উপর রাগ করো না—আমরা বড় দুঃখী। সব কথাগুলো একটু তলিয়ে যদি দেখ'—তা' হলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, তোমার বাবার চালাকিটা কি রকম। আমার যদ্দূর মনে হয়, তাতে ও-ঠিকুজী-কুষ্ঠীর মিলটিল সব মিছে কথা। কেবল তোমাদের মনরাখা করে ক'নে দেখ্‌তে এসেছিলেন; এঁচেই এসেছিলেন যে, কোনও একটা ওজর করে' এ বিয়ে যাতে না হতে পায়, তাই কর্‌তে হবে। কাজেই ঠিকুজী চাইলেন, আমিও সরল মনে বের করে দিলাম। তাঁর এতে সুবিধেই হ'ল—সাপ মর্‌ল, অথচ লাঠি ভাঙ্‌লো না। গিন্নি স্বর্গে গেছেন, তাঁর কথা, তোমাদের সব্বারই কথা, মণিরও কথা সব রক্ষা হ'ল—অথচ বিয়েও

দিতে হল না। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হল। বুদ্ধিমান্ লোক কি না, তাই কৌশল কর্‌লেন; সোজাসুজি যদি বিয়ে দেব না বলেন, তা'হলে মেয়ে জামাই ছেলে সবাই মনে দুঃখু কর্‌বে। কাজেই এমন উপায় ঠাওরালেন্ যে, আর কারও টু শব্দটি পর্য্যন্ত কর্‌বার মুখ রইল না।"

সুলতা পিতার পক্ষ সমর্থনের আশা ছাড়িয়া দিল।

মেনকা দুঃখ ভুলিয়া কতকটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ থামিয়া কহিল, "মেয়ে দেখার দিনেই আমি তোমার বাবার মতলবের কতকটা আঁচ পেয়েছিলাম। তোমরা লক্ষ্য করেছিলে কি না জানি না, মা, ভাবী পুত্রবধূকে, না হয় পুত্রবধূ না-ই হ'ল, একজন পরের মেয়েকে দেখ্‌তে গিয়ে—"মা" বলে সম্বোধন কর্‌তে হয় না? কোথায় বিয়ে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু একজন ভদ্রকন্যাকে "মা" বলে সম্বোধন কর্‌লে, তাঁর মানের কোনও হানি হ'ত না! এসব সবাই করে, হোন্ না তিনি বড়মানুষ"—

এই ছোট্ট ঘটনাটি সেই দিনই সুলতাও লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু কাহারও সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করে নাই। এই বিস্মৃতপ্রায় ছোট্ট ব্যাপারটি সুলতার মনে পড়ায়, তাহার মাথা লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িল!

মেনকা নীরবে সুলতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সুলতা অধোমুখী। সকলেই নির্ব্বাক্।

রজনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া মণীশের পৃষ্ঠে হাত রাখিতেই মণীশ চমকিয়া উঠিল। রজনী কহিল—"এস, মণি, ছাদে একটু বেড়াইগে, বড্ড গরম নীচে—উঃ একটু যদি হাওয়া আছে!—"

মণীশ কক্ষান্তরে উঠিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে মণীশ ঢাকায় ফিরিয়া গেল। ভ্রাতার এই অকস্মাৎ কলিকাতা পরিত্যাগের মূলে যে নিদারুণ মনস্তাপ ও নিরাশ প্রাণের অকথিত বেদনাভার লুক্কায়িত, ভগিনী সুলতার নিকট তাহা অগোচর রহিল না।

তিন চারি দিন রজনী ও সুলতা কেবলি তর্ক পরামর্শ করিল, কিন্তু রায়বাহাদুরের এ রহস্য অথবা মনোভাবের কোন কূল-কিনারাই করিতে পারিল্ না। অগত্যা মেনকা-কথিত উপসংহারই মানিয়া লইতে বাধ্য হইল।

রজনী কহিল—"এ-ই বা কেমন জিদ, তা তো বুঝ্‌লুম না। এতে তিনি যে নিজের ছেলেকে পর করে ফেল্‌বেন, তা' বুঝ্‌তে পার্‌লেন না?"

সুলতা মাতৃহীন একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদরের দুঃখে সমব্যথিনী হইয়া কহিল—"কে জানে? ভীমরতি হয়েচে! অকারণ কতকগুলো মিছে কথা বলে, একটা তৈরি জীবন এমন করে নষ্ট করে দিচ্ছেন—এতে পাপ হয় না? বুড়ো হয়েচেন, ষাট বছর বয়স হতে চল্‌ল, উনি কি বোঝেন না? খুব বোঝেন, তবে ঐ জিদ্! জিদেরও পোড়া কপাল, ব্রহ্মচর্য্য পালনেরও পোড়া কপাল!"

রজনী। এতে ধাঁ করে' একটা কোনও শক্ত অসুখ করে', এমন কি, হার্টফেল ক'রে, মণি মারাও যেতে পারে।

সুলতা সজলনয়নে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"হাঁ, তা' পারে বৈকি! আমি ভাব্‌চি অন্য কথা। মণি বাপের কথা না রেখে, যদি জোর করে ঐখানেই বিয়ে করে? কিম্বা যদি খৃষ্টান হয়? সন্ন্যাসী হয়ে চলেও যেতে পারে ত? তেমন বয়াটে একালের ছেলেদের মত ছেলে যদি মণি হত, তাহ'লে তো এতদিন বাবাকে সে থোড়াই কেয়ার কর্‌ত। মণি তো সে-রকম নয়, বাবার ভাগ্যি যে তিনি এমন মুখচোরা ছেলে পেয়েচেন—যা' কর্‌চেন, যা' বল্‌চেন, তাই শোভা পাচ্ছে।"

রজনী কহিল—"বাস্তবিক!"

উভয়ে কিয়ৎকাল নীরব রহিল। হঠাৎ অন্ধকারে আলোকের সন্ধান পাইয়া ক্ষীণ হাসির রেখাপাতে অশ্রুপ্লুত মুখখানিকে সমুজ্জল করিয়া সুলতা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, একটা কাজ কর্‌লে হয় না? বাবা যাই বলুন্‌, আমরা দাঁড়িয়ে যদি ঐখানেই মণির বিয়ে দিই—তাতে ক্ষতি কি? এ দু'টি জীবনকে তো সুখী করা হবে। বাবা না হয় রাগ কর্‌বেন—তাতে আর এমন কি আস্‌বে যাবে?"

রজনী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল,—"হাঁ, কোষ্ঠীর মিল্‌-ফিল্‌ যখন ঝুট্‌ বাত, তখন এ কায কর্‌লেই বা কি হয়? না হয় তোমার বাবা আমাদের উপর রাগ কর্‌বেন। তাতে মণিরই বা ক্ষতি কি? সে লেখাপড়া শিখেচে, ভাল চাকরীও হয়েচে—তার অভাব কি! যদি মনের মত স্ত্রী নিয়ে সংসার ফাঁদা যায়, তাহ'লে দুঃখও যে সুখ হয়ে ওঠে। মনে শান্তি সুখ থাক্‌লেই, সর্ব্বত্র শান্তি সুখ। মনে যদি সুখ না থাকে, তাহ'লে রাজপ্রাসাদে ও রাজৈশ্বর্য্যেও সুখ নাই। মণি এতে, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই রাজী হবে—কি বল।"

সুলতা কহিল—"আমার তো তাই মনে হচ্ছে।—"

সুলতার কথা শেষ হইতে না হইতেই ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাফ লইয়া আসিল। সুলতার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বামীর মুখপানে জিজ্ঞাসুনেত্রে সুলতা চাহিয়া রহিল।

রজনী টেলিগ্রামখানি পড়িয়া জানাইল—"মণির ঢাকায় পৌঁছে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েচে; আমাদিকে যেতে লিখেচে।"

সুলতার মুখখানা প্রসন্ন হইয়া আসিতেছিল, আবার মেঘাচ্ছন্ন হইল। রজনী কহিল—"এক্ষুনি বল্‌ছিলাম, এ-রকম ক্ষেত্রে একটা শক্ত ব্যারাম না হয়ে প্রায়ই যায় না।"

স্থির হইল, আগামী প্রত্যূষের গাড়ীতে ঢাকা যাত্রা করিয়া রজনী ও সুলতা মণীশকে কলিকাতায় লইয়া আসিবে এবং বিবাহ দিয়া সস্ত্রীক তাহাকে কর্ম্মস্থানে পাঠাইবে।

* * *

প্রায় ১৫ দিন কাটিয়া গিয়াছে। মণীশ এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত; তবে বড় দুর্ব্বল। হার্টের দুর্ব্বলতাই বেশী। চলাফেরা, শ্রমসাধ্য কাষ, চিন্তা—মণীশের এখন সব বন্ধ। চিকিৎসা ও ঔষধ রীতিমত চলিতেছে। মণীশ কলিকাতায়।

আষাঢ়ের শেষাশেষি, মাসের ২৮শে। কলিকাতায় বেশ বর্ষা নামিয়াছে। এবার মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা নয়; কয়েক দিন হইতেই সূর্য্যদেবকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। হাওড়া ও শিয়ালদহের ডেলি-প্যাসেঞ্জারের দল সকাল-সন্ধ্যা হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া, ছাতামুড়ি দিয়া, হাতে জুতা তুলিয়া, খালি পায়ে চলিতে চলিতে

মনিবকে ও বৃষ্টিকে তুল্যরূপে গালি বণ্টন করিয়া এবং চল্‌তি মোটরের উৎক্ষিপ্ত কাদায় জামা কাপড় কর্দ্দমাক্ত করিয়া রোষে শ্লীলতার সীমা রক্ষা পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না—তবুও বর্ষণের ক্ষান্তি নাই। নূতনবাজারে ও জগুবাবুর বাজারে ইলিশ মাছের সের দেড় টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; তরকারীর বাজার খালি বলিলেই হয়। কলিকাতায় মহাদুর্য্যোগ। কলিকাতার আদিম অধিবাসীরা সকাল-সন্ধ্যা পাঁচ ছয় পেয়ালা চা' ও গরম গরম ফুলুরি এবং খিঁচুড়ি ও ইলিশ্ মাছ ভাজা খাইয়া কোনও মতে কষ্টে স্বষ্টে দিন গুজ্‌রাণ করিতেছে।

বৈকালে একটু জল ছাড়িয়াছিল। ট্যাক্সি চড়িয়া রজনী, সুলতা ও মণীশ রায়বাহাদুরের বাসার দিকে চলিয়াছে। উদ্দেশ্য, পিতাকে মণীশের আরোগ্য সংবাদ দেওয়া। কারণ, ঢাকা হইতে তাঁহাকে ৩।৪ খানি পত্র দিয়াও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

রায়বাহাদুরের বাসার সম্মুখে আসিয়া ট্যাক্সি দাঁড়াইল। রজনী নামিয়াই দেখিল, দোতলার বারান্দার রেলিং হইতে দড়ি-বাঁধা একটা কাগজ ঝুলিতেছে, তাহাতে লেখা আছে—"এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবেক।" নীচের দুইটি দুয়ারেও বাঙ্গলায় উক্ত বাক্য এবং ইংরাজীতে "To let" লেখা কাগজ আঠা দিয়া আঁটা। পাশে একটা পানের দোকান। দোকানদারকে রজনী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, এ বাড়ীর ভাড়াটে আজ ১৪।১৫ দিন হইল কাশী চলিয়া গিয়াছে; অন্য বাড়ীর বাসিন্দারাও ইহার বেশী আর কিছুই বলিতে পারিল না।

সুলতা শুনিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইল; কারণ, সে আজ বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছিল। অথচ ইহাদিগকে বা

মণীশকে কোনও সংবাদ না দিয়া, নির্দ্দিষ্ট দিনের এত পূর্ব্বে অকস্মাৎ তাঁহার কাশী-যাত্রার সংবাদে সকলেই যুগপৎ বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

সুলতা কাঁদ' কাঁদ' হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি বাবা সন্ন্যেসী হয়ে গেলেন? বুড়ো বয়সে এই পত্নীবিয়োগ-দুঃখ সইতে না পেরে বাবা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে এমন লুকিয়ে পালিয়েচেন্।"

মণীশ ও রজনী সুলতাকে অধীর হইতে নিষেধ করিয়া, বহু প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ করিল। মণীশের প্রস্তাবে নিকটস্থ ভবানীপুর পোষ্ট আফিসে গিয়া রায়বাহাদুরের বর্ত্তমান ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাঁহার চিঠি-পত্র বেনারসের পোষ্ট-মাষ্টারের কেয়ারে পাঠান হয়। ট্যাক্সি বাড়ী ফিরিল—সকলেই রায় বাহাদুরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সন্ন্যাস-গ্রহণের আশঙ্কায় বড় ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত।

তৎকালীন আকাশের ন্যায় সকলের মুখই শোকে গম্ভীর এবং চিন্তায় কালো। ঘরে ঢুকিয়াই রজনী দেখিল, কয়েকখানি পত্র টেবিলে রহিয়াছে। নিজের পত্রখানি রাখিয়া, মণীশের একখানি ও সুলতার একখানি পত্র তাহাদের হাতে হাতে দিয়া, রজনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মক্কেলের পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। মণীশকে তাহার ঢাকার জনৈক বন্ধু লিখিয়াছে। সুলতা পত্র পাইয়া কহিল—"এ আবার কার চিঠি?" পত্র পড়িয়াই সুলতা নিকটস্থ সোফায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

রজনী ও মণীশ তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল' কি হল'? কার চিঠি?—"

সুলতার মুখখানা তখন মড়ার মত ফ্যাকাশে। অবসন্ন হাতে স্বামীর দিকে পত্রখানা ঠেলিয়া দিল।

রজনী ও মণীশ সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমুজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে সশঙ্ক কৌতূহলী চিত্তে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। পত্রখানি এইরূপ—

৪ ভেলাপুরা
বেনারস।
২৬শে আষাঢ়।

সবিনয় নিবেদন

আপনাকে আজ কি বলিয়া সম্বোধন করিব ঠিক করিতে না পারিয়া, উক্ত পাঠ দিলাম; ঠিক হইল কি না জানি না, এবং জানিবার আর সুবিধাও হইবে না—কারণ এ পত্র যখন আপনার হস্তগত হইবে, তখন আমি আর এ পৃথিবীর কেহই থাকিব না।

বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। তাঁরই অমোঘ শাসনের বলে আমি আজ আপনার ভ্রাতৃজায়া না হইয়া, আপনার মাতৃস্থানীয়া অর্থাৎ আপনার পিতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের বিবাহিতা পত্নী। গত ২৩শে আষাঢ় এখানে আমাদের শুভ (?) বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ আমাদের ফুলশয্যা!! আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। সকলেরই শোক দুঃখ নিবারণ করিতে যে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার শোকজীর্ণ

পিতার মুখে হাসি ফুটিয়াছে, তাঁর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-তপস্যার অবসান হইয়াছে; আমার মাতারও নয়নাশ্রু শুকাইয়াছে। তিনি কলিকাতার বাড়ীটি ঋণমুক্ত করিয়াছেন; আমার ছোট ভগিনী তিনটির বিবাহের জন্য দশ হাজার টাকাও মায়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছে—আর ভাবনা কি? সকলকেই সুখী করিয়াছি, ইহাই আমার সান্ত্বনা!

আপনার সতী-সাধ্বী জননী চাহিয়াছিলেন, আমায় তাঁহার ঘরে আনিতে; কিন্তু আমি যে তাঁহারই শূন্য সিংহাসনে বসিব, একথা অবশ্য তিনি কল্পনাও করেন নাই—বা আমিও করি নাই। যাহাই হউক্, সতীর বাক্য ও কামনাও পূর্ণ হইয়াছে। এইবার আমার ছুটি! আমার কাজ ফুরাইয়াছে!! আমার ব্যথা কেহই বুঝে নাই—আমার সুখের জন্য কেহই ব্যস্ত নয়! আপনার পিতা চাহিয়াছিলেন আমায় বিবাহ করিয়া সুখী হইতে; আমার গর্ভধারিণী চাহিয়াছিলেন কন্যার বিবাহের বিনিময়ে দারিদ্র্যনিবারণ করিয়া নষ্টসম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিতে;—উভয়ের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে! ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সুখে রাখুন্। মণি-কর্ণিকার স্বচ্ছ শীতল কালো জলে আজ আমার ফুলশয্যা হইবে!!

আমি আপনার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী; কিন্তু তাঁর ধর্ম্মপত্নী হইতে না পারায়, ধর্ম্মরাজের কাছে হয়ত দণ্ডভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে দণ্ডভোগ করিতেছি, তার তুলনায় সে দণ্ড নিশ্চয়ই কোমল; আর যদি কঠোরতরও হয়, তবু আমি তার জন্য প্রস্তুত।

এ মর্ত্ত্যভূমিতে আর আপনাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে না;

তাই এই শেষ-বিদায়ের বেলায় আপনারা আমার মিনতিভরা প্রণাম লউন। আপনার ভাইকে আমার জন্ম-জন্মান্তরের কামনাপূর্ণ প্রণতি দিয়া বলিবেন যে, তাঁর মাধবী সর্ব্বান্তঃকরণে মরণে ও পুনর্জন্মেও তাঁরই, শুধু তাঁরই। তাঁহার চরণে আমার শতসহস্র প্রণাম.।

আপনাদের স্নেহমুগ্ধা
মাধবী।

পত্রপাঠান্তে রজনীর চোখ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। মণীশ মাতালের মত টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। অনুপমা তাড়াতাড়ি মাতুলকে উঠাইতে গিয়া বলিল—"বাবা, প'ড়ে গিয়ে মামার ফিট্ হয়ে গেছে!"

জগদীশ্বর জানেন, মণীশের পড়িয়া ফিট্ হয় নাই, ফিট্ হইয়াই সে পড়িয়াছিল।

সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

মায়ামৃগ—২॥০ দিবাস্বপ্ন—২৲

সুন্দরী—২৲

ছোট গল্প

পঙ্কজিনী—১।০ শাপমুক্তি—১।০

নাটক

অবশেষে—॥০ মীরাবাঈ—১৲

জীবনী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—২৲

(প্রায় ৫০ খানি দুষ্প্রাপ্য হাফটোন চিত্রসহ)

কাব্য-গ্রন্থাবলী

মন্দিরা (২য় সংস্করণ)—॥৵০ পত্রচিত্র—৸০

খঞ্জনী ঐ ।৵০ পঙ্কপাত্র—৸০

চিত্র ও চিত্ত (গাথাকাব্য)—১৲